মিলনে বিরহে

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

মডার্ন কলাম
১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারী ১৯৬১

প্রকাশিকা ঃ লতিকা সাহা । মডার্ন কলাম । ১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৯

মুদ্রাকর ঃ অনিলকুমার ঘোষ । নিউ ঘোষ প্রেস । ৪/১ই বিডন রো, কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ ঃ গৌতম রায়

মিলনে বিরহে

সকালে উঠে প্রফুল্লবাবু ছেলের চিঠিখানা আর একবার পড়লেন। চিঠি অবশ্য তাঁর কাছে লেখা নয়। দিলীপ তার মাকেই লিখেছে চিঠি। বিলাত যাওয়ার পর থেকে প্রথম প্রথম সে সবাইকেই চিঠি দিত। বাবা মা ভাই ও বোনেরা এমন কি পাড়াপড়শী সম্পর্কে মাসীপিসীদেরও চিঠি লিখত। তারপর ধীরে ধীরে সেই সহস্রধারা হ্রাস হয়ে যায়। কিন্তু মায়ের কাছে সপ্তাহে একখানা চিঠি দিলীপ নিয়মিত লেখে। ওর মার চিঠিপত্র লেখার অভ্যাস কম। কিন্তু ছেলের চিঠির জবাব দিতে তাঁর দেরি হয় না। নিতান্ত অসুস্থ হয়ে না পড়লে কোন চিঠির জবাব বাদও যায় না। বিদেশে গিয়েও মাকে এত গভীরভাবে মনে রাখে এমন ছেলের সংখ্যা আজকাল বেশি নয়। আর মা যেন শুধু মাই নয় মা যেন একটি প্রতীক। মার সঙ্গে যার সংযোগ নিবিড় সে সেই নাড়ীর টানে সমগ্র পরিবারকে ভালোবাসে দেশকে ভালোবাসে। দিলীপও বিদেশে গিয়ে সেই নষ্টালজিয়া ছাড়তে পারেনি। প্রথম প্রথম চিঠিতে কেবলই বাড়ির কথা লিখত। 'মা তোমাকে প্রায় রোজ রাত্রে স্বপ্ন দেখি। মনে হয় যেন তোমাদের পাশের ঘরটিতেই শুয়ে আছি।'

প্রফুল্লবাবুর আশঙ্কা হত বাড়ির ওপর এত যার টান সে বোধ-হয় বিদেশে গিয়ে বেশি দিন থাকতে পারবে না। চাকরি বাকরি ছেড়ে দিয়ে ফিরে আসবে। তখন এই কলকাতায় ভাল মাইনের চাকরি পাওয়া কঠিন হবে। কিন্তু হয়নি। দিলীপ পুরো তিন বছর লণ্ডনে কাটাল। এর মধ্যে একবারও ছুটি নিয়ে বাড়ি আসেনি। বাড়ি আসবার কথায় লিখেছে, 'মা যাতায়াতে যে খরচ সেই টাকাটা বাড়িতে পাঠিয়ে দিলে কাজে লাগবে। কি কিছু জিনিসপত্র কিনে পাঠালে তোমরা ব্যবহার করতে পারবে।'

দিলীপের মা এই সব চিঠি পড়ে স্বামীকে অনুযোগের সুরে বলতেন, 'তুমি বোধহয় অভাব অভিযোগের কথা বেশি করে ওকে জানাও তাই দিলুও কেবল টাকার হিসাবই করে। ছেলের কাছে

কি টাকা? ওকে যদি পাঁচটি দিনের জন্যেও কাছে পেতাম সেই সুখ কি আমার পাঁচ হাজার টাকার চেয়েও বেশি হত না?'

প্রফুল্লবাবুরও সে কথা মাঝে মাঝে মনে হত। ছেলেকে দেখতে ইচ্ছা করত। অফিস থেকে বাড়িতে ফিরে বড় ছেলেকে না দেখতে পেয়ে ফাঁকা ফাঁকা লাগত।

প্রতিবেশী বন্ধু সুরেন মজুমদারকে প্রায়ই বলতেন, 'ডিসিশনটা বোধ হয় ঠিক হল না সুরেনবাবু। ছেলেকে অতদূরে পাঠিয়ে ভালো করিনি হয়তো। কথায় আছে অঋণী অপ্রবাসী থাকার মত সুখ নেই।'

সুরেনবাবু বাজারের থলি হাতে বাড়ি থেকে বেরোতেন। প্রফুল্লবাবুর বাজারের সঙ্গী তিনি। দুজনেই মাছ ভালোবাসেন। বড় মাছ-টাছ পেলে এক সাথে কিনে ভাগাভাগি করে নেন।

সুরেনবাবু বন্ধুকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'দূর মশাই, অঋণী অপ্রবাসী আজকাল ও কথার কোন মানে নেই। যতই চাপাচাপি করে থাকুন মাসের শেষে ধার আপনার হবেই। আর প্রবাস? আজকাল আবার প্রবাস বলে কিছু আছে নাকি? পঁচিশ তিরিশ বছর আগে এখান থেকে কেউ যদি পাটনায় গিয়ে থাকত আমরা তাকে বলতাম প্রবাসী বাঙালী। এখন পাঁচটি মহাদেশের যে কোন জায়গায় আপনি থাকুন আপনাকে কেউ প্রবাসী বলবে না। ও কথাটা একেবারে বাসি হয়ে গেছে।'

প্রফুল্লবাবু স্মিতমুখে বলেন, 'তাই নাকি?'

সুরেনবাবু বলেন, 'তাছাড়া কি? লণ্ডন থেকে প্লেনে এই কলকাতায় কতটা লাগে। চব্বিশ ঘণ্টারও কম। ভেবে দেখুন পৃথিবীটা কত ছোট হয়ে গেছে! টেবিলের ওপর রাখা একটি গ্লোবের মত।'

স্কুলে মাষ্টারি করেন সুরেনবাবু। কিন্তু মতামত মোটেই সেকেলে পণ্ডিতের মত নয়। পঞ্চাশ পার করে দিয়েও অনেক ব্যাপারে তিনি খুব উদার এবং প্রগতিশীল।

প্রফুল্লবাবু বলেন, 'তবু কাছাকাছি থাকার যে আনন্দ—এক-সঙ্গে ওঠা বসা মুখোমুখি বসে কথা বলা—'

সুরেনবাবু হেসে বলেন, 'নিজের যৌবনটাকে দেখা বলুন। ও

সব কাব্যে ভালো শোনায়। কিন্তু এমন বাপ ছেলেও আছে যারা পাশাপাশি ঘরে থেকেও এক পক্ষের সঙ্গে আর একপক্ষ কথা বলে না। যখন কথা বলে পাড়ার লোকে ভাবে ডাকাত পড়েছে। তার চেয়ে মশাই ছেলে দূরে থাকে সেই ভালো, তাতে সম্পর্কটা ভালো থাকে।'

ছেলেদের সঙ্গে সুরেনবাবুর সম্পর্ক ভালো নয় প্রফুল্লবাবু তা জানেন। কিন্তু দিলীপের কথা আলাদা, সে বাপ মাকে ভালোবাসে ভাই বোনকে ভালোবাসে। বিলেতে গিয়েও সে নিয়মিত টাকা পাঠায়! বলতে গেলে তার টাকাতেই সংসারের বেশির ভাগ খরচ চলে।

চিঠিখানা আবার পড়লেন প্রফুল্লবাবু। মার কাছেই লিখেছে চিঠি। একজনকে লিখলে সে চিঠি বাড়ির সবাই পড়ে। বরং বোন সুমির কাছে যে সব চিঠি লেখে সেগুলি প্রফুল্লবাবু পড়েন না। বোনের কাছে নানা রকম উচ্ছ্বাস উচ্ছলতা প্রকাশ করে দিলীপ। কবিত্ব-টবিত্ব করে। তাছাড়া সুমির বন্ধু সুতপা বলে যে মেয়েটিকে দিলু ভালোবাসে তার কথাও বোনের চিঠিতেই বেশি লেখে। তাই সুমি নিজে না দেখালে প্রফুল্লবাবু সে চিঠি বড় দেখতে চান না।

দিলীপের এবারকার চিঠি খুব সংক্ষিপ্ত। সে লিখেছে—

শ্রীচরণকমলেষু,

মা, আমি এখানে ঘটনাচক্রে পড়ে একটি মেয়েকে বিয়ে করেছি। তার নাম রীজা। নাম দেখে ভেবো না সে ইংরেজ কি জার্মান। সে বাঙালী মেয়েই। অবশ্য আমাদের মত ব্রাহ্মণ নয়, কায়স্থ তবে খুবই ভদ্র সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ে। দেখতে মোটামুটি সুশ্রী। লেখাপড়া জানে। ঘর সংসারের কাজকর্ম সেবা পরিচর্যাও বেশ ভালো করতে পারে। যখন বাড়িতে ফিরব মনে হয় সে তোমাদের খুশি করতে পারবে।

বাবাকে আলাদা চিঠি দিলাম না। তিনি যেন রাগ না করেন, তাঁকে এবং অন্যান্য সবাইকে পরে চিঠি লিখব।

আগে অনুমতি নিতে পারিনি বলে আশা করি তোমাদের আশীর্বাদ লাভে বঞ্চিত হব না।

তোমার চিঠি পেলে তোমাদের পুত্রবধূর ফটো পরের ডাকে পাঠাবো। তোমরা দুজন আমার প্রণাম নিয়ো। সুমি সুবীরকে স্নেহাশিস্ জানাই। ইতি—

প্রণত : প্রদীপ

চিঠিখানা পড়ে ভাঁজ করে সোফার হাতলের ওপর রাখলেন প্রফুল্লবাবু। তারপর একটুকাল গালে হাত দিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে রইলেন।

'ও কি তুমি এখনো বসে আছ? বাজারে যাওনি?'

স্ত্রীর কথায় চমকে উঠলেন প্রফুল্লবাবু। ভিতর থেকে লতিকা যে কখন এসে দাঁড়িয়েছেন তা তিনি টেরই পাননি।

প্রফুল্লবাবু বললেন, 'যাচ্ছি যাচ্ছি।'

লতিকা বললেন, 'যাচ্ছি যাচ্ছি কি। এরপর তুমিই তো তাড়া-হুড়ো লাগাবে। শেষে মাছ কুটে রান্না করে দেওয়ার সময় থাকবে না।'

প্রফুল্লবাবু বললেন, 'আমায় কেন বিরক্ত করছ? আমার সময় ঠিক আছে।'

লতিকা বললেন, 'শুধু তোমার সময় ঠিক থাকলেই তো হবে না। রান্না বান্নার সময়টুকু তো আমাকে দিতে হবে। দুদিন ধরে আবার প্রমদা কামাই করেছে। ওকি তুমি আবার দিলুর চিঠিখানা বের করে নিয়ে এসেছ নাকি?'

প্রফুল্লবাবু বললেন, 'এনেছি তা কী হয়েছে। চিঠিখানা আর একবার পড়লাম।'

লতিকা একটু হাসলেন, 'এর আগে তো দুবার পড়েছ। ছেলের চিঠি কি তুমি মুখস্ত করে ফেলতে চাও নাকি।' প্রফুল্লবাবু বললেন, 'মুখস্ত করবার মত চিঠিই তোমার ছেলে লিখেছে! এর পরিণামটা কি তুমি ভেবে দেখেছ?'

লতিকা ততক্ষণে চিঠিখানা চেয়ারের হাতলের ওপর থেকে তুলে নিলেন তারপর স্বামীর বিপরীত দিকে যে সোফাটি রয়েছে তার ওপর বসে পড়ে বললেন, 'এর আবার ভাবাভাবির কী আছে। ছেলের বয়স হয়েছে, বিদেশে সে চাকরি করতে গেছে। সেখানে পছন্দ মত মেয়েকে দেখে শুনে বিয়ে করেছে। এই তো আজকালকার

দস্তুর। এতে ভাবাভাবির কিছু নেই। যাও বাজারে যাও।'

প্রফুল্লবাবু বললেন, 'যাচ্ছি! বাজার বাজার করে অত ব্যস্ত হয়েছ কেন। একদিন বাজার নাইবা হল।'

লতিকা বললেন, 'তাতে আর কারো কোন অসুবিধা হবে না, তোমারই কষ্ট হবে। তুমিই মাছ ছাড়া খেতে পার না।'

প্রফুল্লবাবু একটু হাসলেন, 'এরপর নিয়মিত মাছ শুধু আমার কেন কারোরই জুটবে না।'

লতিকা কথাটা যেন ঠিক বুঝতে পারলেন না। একটু ভ্রূ-কুঁচকে পরে বললেন, 'তার মানে?'

প্রফুল্লবাবু বললেন, 'এরপর কিছু কি আর বিশ পাউণ্ড বাইশ পাউণ্ড করে মাসে মাসে পাঠাতে পারবে?'

লতিকা বিস্মিতভাবে স্বামীর দিকে একটুকাল তাকিয়ে রইলেন। তারপর একটু বিদ্রূপের সুরে বললেন, 'ও! সেই জন্যেই বুঝি তোমার এত চিন্তা! ছেলে বিয়ে করেছে লণ্ডনে তাকে আলাদা বাসা করে থাকতে হবে, সে আর তোমাকে মাসে মাসে অত টাকা পাঠাতে পারবে না এখন থেকেই তোমার এই ভয় হয়েছে মনে? না যদি পারে নাইবা পারল? আমাদের যা জোটে তাই আমরা খাব। তাই বলে ছেলে বিয়ে করবে না? তার নিজের ঘর সংসার হবে না? তুমি শুধু তোমার নিজের সংসারের কথাই ভাববে? ছেলের সাধ আহ্লাদের দিকে তাকাবে না। তুমি না বাপ? কই আমার তো অর্থের চিন্তা একবারও মনে আসেনি।'

লতিকা এক সঙ্গে অনেক প্রশ্ন, অনেক অভিযোগ করে বসলেন। রোগা ছোটখাট চেহারা। এমনিতে কথা খুব বেশি বলেন না। কিন্তু রাগলে তার মেজাজ অন্যরকম হয়ে যায়। তখন অনর্গল কথা বেরোতে থাকে। গলাও চড়ে যায়।

প্রফুল্লবাবু ভারি বিব্রতবোধ করতে থাকেন। সত্যি, আর্থিক সমস্যার কথাটা প্রফুল্লবাবু যেন ইচ্ছা করে তুলতে চাননি। হঠাৎ তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে। প্রফুল্লবাবুর রোজগার আগের মত নেই। চাকরি ছাড়াও বন্ধু বিদ্যুৎ সিকদারের সঙ্গে তিনি যে একটা সাইড বিজনেস করছিলেন তাতে লোকসান যাচ্ছে। সেই অ্যাম্পুলের কারখানা বোধহয় এবার বন্ধ করেই দিতে হবে। এদিকে

মেয়ে বড় হয়েছে। বি. এ. পাশ করে সাধারণ একটা আন-অ্যাফিলিয়েটেড প্রাইভেট স্কুলে কাজ করছে। যা মাইনে পায় তাতে তার হাত খরচ আর টুকিটাকি সৌখীন জিনিসপত্রই দু'একটা হয়। মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। কিছু সঞ্চয় অবশ্য আছে। কিন্তু সবতো আর নাই। ছোট ছেলেটিও প্রায় বেকার। পাকা চাকরি কোথাও জোটেনি। এক বন্ধুর ফার্মে অ্যাপ্রেণ্টিস হিসেবে আছে। শ'খানেক টাকা অ্যালাউন্স হিসেবে পায়। সেটা তার নিজের যাতায়াত, টিফিন আর সিগারেট সিনেমাতেই লেগে যায়। এই অবস্থায় অর্থ চিন্তাটা আসে বইকি। তবু আশ্চর্য টাকা-পয়সার কথাটা গোড়াতে তিনি তুলতে চাননি। তুলতে চেয়েছিলেন অন্য প্রসঙ্গ। সেটা যে কেন চাপা পড়ে গেল তা তিনি নিজেই বুঝতে পারছেন না।

'মা কেন তোমরা বাইরের ঘরে এত চেঁচামেচি করছ। যা বলতে হয় ভিতরে এসে বলনা।'

সুমি ঘরে ঢুকে মাকে অনুযোগ করল।

প্রফুল্লবাবু একটু জোর পেলেন। মেয়ে সাধারণত বাবার পক্ষ নিয়েই কথা বলে। লতিকা বললেন, 'চেঁচামেচি কি আমি করছি বাপু। উনি কোথায় বাজারে যাবেন, বেলা হয়ে যাচ্ছে, তা না গিয়ে যতসব বাজে আলোচনা শুরু করে দিয়েছেন। যা হয়ে গেছে তা তো হয়েই গেছে। এখন এই সাত সমুদ্দুর তের নদীর এপারে বসে তা নিয়ে আমরা যদি নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করি তাতে কারো কি কোন লাভ আছে?'

সুমি বলল, 'ব্যাপারটা কি। দাদার বিয়ের খবর তো! তা নিয়ে কালই তো তোমরা কথাবার্তা বলেছ। আজ আবার সাত সকালে সে কথা তুলছো কেন বাবা?'

শুধু মাকে নয়, মেয়ে যে তার বিরুদ্ধেও অভিযোগ করবে প্রফুল্লবাবু যেন তা ভাবতে পারেন নি।

প্রফুল্লবাবু একটু হেসে শান্তভাবে বললেন, 'শুধু এক রাত্রির আলোচনাতেই তো ব্যাপারটার সমাধান হয়ে যায় না সুমি।'

সুমি মার মত চেঁচালো না। বাপের মতই হেসে শান্তভাবে বলল, 'কিন্তু তুমি সাত রাত্রির আলোচনা করেই বা এর কি সমাধান করতে পারবে?'

প্রফুল্লবাবু বললেন, 'আমি ভাবছি আমার ছেলে হয়ে দিলীপ এতটা নিষ্ঠুর এতটা অবিবেচক হল কী করে? একটি মেয়েকে সে এখানে বিয়ে করবে বলে কথা দিয়ে গেছে। ঘটকালি করা সম্বন্ধ নয়। সে মেয়েটিকে নিজে ভালোবেসেছে। মেয়েটি তার জন্য অপেক্ষা করে আছে। আর আজ বিলেতে গিয়ে সে আর একটি মেয়েকে বিয়ে করে বসল? তার বিবেকে একবার নিল না?'

সুমি বলল, 'কাজটা ভালো হয়নি। সে কথা ঠিকই। কিন্তু এখন তো আমাদের কিছু করবারও নেই, আমি যাব একবার সুতপাদের বাড়িতে। সে তো আমারই বন্ধু। তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলতে হবে।'

প্রফুল্লবাবু বললেন, 'পারবি তুই বুঝিয়ে বলতে?' সুমি বলল, 'পারব না কেন? দাদাও হয়তো ব্যাপারটা ওদের আগেই জানিয়েছে। চিঠিপত্রতো চলত ওদের মধ্যে। প্রথমটায় খুব দুঃখ পাবে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সব দুঃখ শোকেরইতো সান্ত্বনা আছে বাবা। সময়মতই ভুলিয়ে দেয়।' যেন সুতপাকে নয় নিজের বাবাকেই সে সান্ত্বনা দিচ্ছে।

ছেলের আচরণে আহত হয়েছেন বইকি প্রফুল্লবাবু। যত গুণী আর বিদ্বান ছেলেই হোক, যত মোটা টাকাই মাইনে পাক চরিত্রের যেটা দোষ সেটা দোষই। কথা দিয়ে কথা না রাখা, বিশেষ করে ভালোবাসার ক্ষেত্রে হৃদয় ধর্মের ব্যাপারে মানুষের এই নির্মমতার কথা প্রফুল্লবাবু ভাবতেই পারেন না। তা ছাড়া সুতপাতো যে সে মেয়ে নয়। যেমন ওর রূপ, তেমনি গুণ। এম. এ পাশ করেছে। তাই বলে ঘরসংসারের কাজে কোন আলস্য নেই। মোটামুটি গাইতেও পারে ভালো। ওর গলায় প্রিয় রবীন্দ্র সঙ্গীত-গুলি প্রফুল্লবাবু বেশ ভালোবাসেন শুনতে। অথচ মেয়েটির কোন অহঙ্কার নেই। ভারি কোমল স্বভাব, সরল অন্তঃকরণ। আজকালকার দিনে এমন মেয়ে বড় একটা দেখা যায় না। অন্ততঃ প্রফুল্লবাবুর চোখে তো পড়ে নি। এমন একটি মেয়েকে কেন তাঁর ছেলে নির্মম আঘাত করল। প্রফুল্লবাবু তা ভেবে পেলেন না। সেই সঙ্গে আর দুটি নারীর—তাঁর স্ত্রী আর মেয়ের ব্যবহার দেখে তিনি বিস্মিত হলেন।

লতিকা তাড়া দিতে লাগলেন, 'বাজারে যাও, বাজারে যাও। এরপর কিছুতেই আর অফিসের রান্না নামবে না।'

নিতান্ত বিরক্ত হয়ে প্রফুল্লবাবু বাজারের থলি নিয়ে বেরোলেন। কাছেই বাজার। নিজেদের বৈঠকখানায় বসে বাজারের গোলমাল শোনা যায়।

কেউ কেউ বেশ বাবু সেজে বাজারে আসেন। ফর্সা ধুতি পাঞ্জাবি পরে তাঁরা দোকানদারের সামনে এসে দাঁড়ান। ভাবেন তাতেই বুঝি আলু পেঁয়াজের দোকানী কি জেলেরা তাঁদের খুব সমীহ করবে। তা করে না। তারাও মানুষ চেনে. খদ্দের কী দরের লোক তা বুঝতে পারে। দোকানদারের মত মনস্তত্ত্ববিদ সংসারে কমই দেখা যায়। তারা ক্রেতার মুখ দেখে বুঝতে পারে তার ঘটে কতখানি বুদ্ধি, পকেটে ক'টি টাকা আর আধুলি আছে।

প্রফুল্লবাবু লুঙ্গি পরে গেঞ্জি গায়ে বাজারে যান। বেশ ঠাণ্ডা মেজাজে বাজার করেন। অথচ প্রতিটি জিনিস দেখে যাচাই করে নেন। দরেও ঠকেন না, জিনিসেও ঠকেন না। তবু দোকানদার তাঁর ওপর চটে না। কিন্তু ভদ্র বলে বাইরে যাঁদের সুখ্যাতি আছে, যাঁরা ফুলবাবুটি সেজে বাজারে আসেন তাঁরাও কি বদমেজাজের পরিচয়ই না দেন। দর কষাকষি চটাচটি কথা কাটাকাটি করে তাঁরা বাজার মাৎ করে রাখেন। কত রকমের মানুষই যে আছে সংসারে। এই বাজারে এলেই তার বহু নমুনা মেলে। মাছ তরকারির বাজার তো নয় একটি ভবের বাজার। বাজারে এসে কেনাকাটা করতে করতে অন্য ক্রেতাদের হাবভাব লক্ষ্য করেন, নিজের মনে হাসেন, মানুষের স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা বাড়ে। পাড়া-পড়শীদের মধ্যে অনেকেই পরিচিত। কেউ কেউ বা বন্ধু স্থানীয়। দেখা হলে ওরই মধ্যে দু একটা সুখ দুঃখের কথাও হয়। চড়া বাজারই হোক আর নরম বাজারই হোক প্রফুল্লবাবুকে কখনোই মেজাজ গরম করতে দেখা যায় না।

কিন্তু আজ বাজারে এসে তাঁর ব্যবহার-ট্যাবহার একটু অন্যরকম। গম্ভীর মুখে তাড়াতাড়ি বাজার সারলেন। বেশ পরিচিত দু একজন ভদ্রলোক তাঁর পাশ দিয়ে চলে গেলেও তিনি কারো সঙ্গে কোন কথা বললেন না।

আলুওয়ালা হরেকৃষ্ণ পোদ্দারের দোকান থেকে আজও তিনি এক কেজি আলু কিনলেন। প্রতিটি আলু বেছে বেছে নিলেন। যাতে কোনটি পচা কি পোকা ধরা না বেরোয়।

দাঁড়ি পাল্লায় আলুগুলির ওজন নিতে নিতে পোদ্দার মশাই বললেন, 'কী বড়বাবু আপনার শরীর টরির খারাপ না কি?'

'না খারাপ কেন হবে?'

'বাড়ির সব ভালো তো?'

প্রফুল্লবাবু বললেন, 'হ্যাঁ ভালোই আছে।'

'ছেলে বিলাত থেকে কবে ফিরছে? অনেকদিন তো হয়ে গেল।'

পোদ্দারের যেন অনন্ত কৌতূহল।

আজ প্রফুল্লবাবু আলুর দোকানীর ব্যবহারে মনে মনে বিরক্ত হলেন। থলিতে আলুগুলি নিয়ে পয়সা গুণে দিয়ে বললেন, 'কী জানি কবে ফিরবে, চিঠিতে তা কিছু লেখেনি।'

পোদ্দার মশাই বললেন, 'আমরা তো বড়বাবু দিন গুনছি। কবে বিলাত ফেরৎ বাবু এসে আমার এই দোকানের সামনে দাঁড়াবেন, বলবেন, এক কেজি পটেটো দাও তো।'

নিজের রসিকতায় পোদ্দার নিজেই হেসে উঠলেন। ছেলেবেলায় স্কুলে ক্লাস ফোর পর্যন্ত পড়েছিলেন। সেই বিদ্যাটুকু প্রয়োগ করতে ভোলেন না। রোজ এই আলুর দোকানে বসে বসে বাংলা খবরের কাগজ পড়েন বা মাঝে মাঝে ইংরেজী কাগজের বড় বড় হেডিং-গুলিতে চোখ বুলিয়ে নেন।

প্রফুল্লবাবু বাজার থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে ভাবলেন, তা ঠিক। ছেলে বিলাত থেকে ফিরে এলেই তবে পাড়ার লোক বলতে পারে বিলাত ফেরৎ। পড়শীরা দেখতে পারে সে কটা ডিগ্রী, কত জিনিষপত্র, ধন সম্পদ নিয়ে ফিরল। কিন্তু বিয়ে করার পর দিলীপ সত্যিই ফিরছে নাকি বিলাতেরই স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যাবে কে জানে। কেউ কেউ তো তাও হয়। যে দেশে যায় সেই দেশেরই কোন মেয়েকে বিয়ে করে সেখানে থেকে যায়। নিজের দেশ গাঁ, বাড়ি ঘর বাপ মার ওপর মমতা আর থাকে না। কামরূপ কামাখ্যা তো শুধু এখানেই নয়, সারা বিশ্বেই ছড়িয়ে আছে। দিলীপ ফিরবে কিনা কে জানে।

বাজার নিয়ে বাড়িতে আসার পর ধরা পড়ল প্রফুল্লবাবু দুটো জিনিষ আনতে ভূলে গেছেন।

লতিকাই সেই ভুল ধরিয়ে দিলেন, 'ওগো কী বাজার করেছ আজ। পান আনো নি, লঙ্কা আনো নি।'

প্রফুল্লবাবু বললেন, 'আজ পান আর লঙ্কা ছাড়াই চলুক।'

লতিকা বললেন, 'তাহলে আজ রান্না খাওয়া ছাড়াই চলুক।'

তারপর স্বামীর আরো কাছে এসে গলা নামিয়ে বললেন, 'কেন তুমি অমন গজ গজ করছ বলতো। হয়েছে কী শুনি? কোন একটি মেয়েকে তো সে বিয়ে করতই। একজনকে না করে আর একজনকে করেছে। তাতে দুঃখে তোমার অত বুক ফেটে যাচ্ছে কেন?'

প্রফুল্লবাবুর এবার রাগ হল। তিনি বেশ একটু উঁচু গলায় বললেন, 'তোমার যদি আত্মমর্যাদা জ্ঞান থাকত তাহলে ছেলের এই ব্যবহারে তুমিও দুঃখ পেতে। নিজের স্বার্থটাকেই অত বড় করে দেখতে না। অল্পবয়সী একটি মেয়ে, তাকে বিয়ে করবে বলে কথা দিয়ে গেছে, আত্মীয় স্বজনের মধ্যে চালু হয়ে গেছে সেই কথা। এখন তিনি জানিয়েছেন কার্যগতিকে তিনি আর একটি মেয়েকে বিয়ে করে ফেলেছেন। কার্যগতিক যে কি তা তো বোঝা যাচ্ছে। বাচ্চা-টাচ্চা আগেই হয়েছে কিনা তাই বা কে জানে?'

লতিকা বললেন, 'হ্যাঁ, বাচ্চা হয়েছে। তুমি যাও। বিলাতে গিয়ে নাতির অন্নপ্রাশন দিয়ে এসো।'

চেঁচামেচিতে সুবীর এতক্ষণে ঘুম থেকে উঠল। সে বাথরুম থেকে কোন রকমে মুখে চোখে একটু জল দিয়ে এসেই বলল, 'মা চা আছে? চা দাও।'

লতিকা বললেন, 'উঠেই চা চা করে আমার 'মাথা' খেতে শুরু করে দিয়েছে। এবার আমাকে খাও।'

সুবীর বলল, 'তোমাকে খেলে তো আমার চায়ের তৃষ্ণা মিটবে না মা। আর তার সঙ্গে বড় জোর একখানা টোস্ট, এই তো ব্রেক ফাস্টের ব্যবস্থা। তুমি না পার, দিদি করে দিক চা।'

লতিকা হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, তোমার ব্রেকফাস্ট ওই টুকুতেই হয় কিনা। অত অল্পেই তুমি তুষ্ট হবার ছেলে। যা আগে বাজার

থেকে পান আর লংকা নিয়ে আয়। উনি ভুলে গেছেন। তারপর এসে চা খেতে বোস।'

প্রফুল্লবাবু তাড়াতাড়ি বললেন, 'আর বাজারে যেতে হবে না। আমিই যাচ্ছি। লংকা তো তোমার বাটা আছে। দেখে গেলাম।'

লতিকা বললেন, 'ওতে হবে না। আরো গোটা কতক লাগবে।'

প্রফুল্লবাবু বললেন, 'আর বেশি লংকা খেয়ে কি হবে অমনিতেই তো ঝাঁজের জ্বালায় অস্থির।'

লতিকা হেসে বললেন, 'আহা লংকা যারা কম খায় তাদেরও ঝাঁজ কিছু কম কিনা।'

প্রফুল্লবাবু নিজেই ফের পান আর লংকা আনতে গেলেন। সুবীরকে বাজারে পাঠিয়ে লাভ নেই। ও কি আর যত্ন করে বেছে টেছে কিছু আনবে? বিশ বছর বয়স হয়েছে ছেলের। বছর খানেক বাদে হয়তো গ্রাজুয়েটও হবে কিন্তু সংসারের কোন দায়িত্ব প্রফুল্লবাবু বিশ্বাস করে ওকে দিতে পারেন না। ও এখনো খেলা ধূলা ক্লাব ট্লাব নিয়েই আছে। দায়িত্ব বোধ ছিল দিলীপের। সংসারের কাজকর্ম সে অল্প বয়স থেকে বুঝে নিয়েছে ভালোও বেসেছে। আশ্চর্য, সেই দিলীপই এমন দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিল। লংকা আর পান স্ত্রীর হাতে দিয়ে প্রফুল্লবাবু বললেন, 'এই নাও তোমার পান। এরপর হয়তো ফরমায়েস করবে যাও চুণ নিয়ে এসো।'

লতিকা বললেন, 'না গো তা আর করব না। চুণ তো একজনের মুখেই দেখতে পাচ্ছি।' তারপর স্বামীর কাছে এসে আরো কোমল স্বরে বললেন, 'তুমি অত ভাবছ কেন বলতো। এতে তোমার যায় কিসের? তুমি তো আর সম্বন্ধ ঠিক করে দাও নি! ওরা নিজেরাই ঠিক করেছে। নিজেরাই পরস্পরকে কথা দিয়েছে। এখন তা নিজেরাই যদি ভাঙে তুমি তার কী করবে?'

প্রফুল্লবাবু প্রতিবাদ করে বললেন, 'দুজন নয়—একজন ভেঙেছে। যে ভেঙেছে সে তোমার আমার দুজনের ছেলে। বিদ্বান বুদ্ধিমান হৃদয়বান বলে যে ছেলেকে নিয়ে আমরা গর্ব করি। লতা, আমাদেরও তো মেয়ে আছে। আমাদের মেয়ের সঙ্গে কোন ছেলে যদি এমন ব্যবহার করত? কেমন লাগত তোমার? সুতপার মার

কথাটাও একবার ভাবো।'

লতিকা ফের একটু বললেন, 'সাধনাদির কথা তো! তাঁর কথা ভাববার জন্যে তুমিই তো আছ। অল্প বয়সে বিধবা তাতে আবার শিক্ষিতা, সুন্দরী! এখনো আমাদের কুটুম্বিতা হয়নি কিছু হয়নি। তুমি কত আগে থেকেই সেখানে যাতায়াত শুরু করেছ। ভাবী বেয়ানের সঙ্গে একটু গল্প করে না এলে এক কাপ চা না খেয়ে এলে তোমার চলে না। আচ্ছা হয়েছে। ছেলের জন্যে তোমার আচ্ছা জ্ঞান হয়েছে।'

প্রফুল্লবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'কী যা তা বলছ।'

তিনি এবার শেভ করতে বসলেন। কথায় কথায় অফিসের বেলা হয়ে গেছে। অন্য দিনের চেয়ে স্নানাহার আজ একটু তাড়াতাড়ি সারতে হবে।

দেয়াল আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সাবান মাখা গালে দ্রুত সেফটি-রেজার টানতে লাগলেন প্রফুল্লবাবু।

খাবার ঘর থেকে সুবীরের গলা কানে এল, 'দাদা তাহলে লণ্ডনেই বিয়ে করেছে মা?'

সুমি বলল, 'সে খবরে তোর দরকার কি?'

সুবীর বলল, 'একটু দরকার আছে দিদি। এবার আমার লাইন ক্লিয়ার হয়ে গেল।'

সুমি বলল, 'লাইন ক্লিয়ার হলেই হল? তোর ট্রেন আসতে এখনো অনেক দেরি। সাত বছর।'

'ঈশ, সাত বছর! তুই বাজি রাখ আমি যদি সাত দিনের মধ্যে বিয়ে না করতে পারি—'

লতিকা বললেন, 'না বাপু, অত বীরত্বে তোমার দরকার নেই। এখনো বি. এ টা পর্যন্ত পাশ করিসনি। চাকরি নেই বাকরি নেই তোকে খাওয়াচ্ছি, আবার তোর বউকেও খাওয়াব?'

সুবীর বলল, 'আজকালকার মাদের মনে স্নেহ টেহ জাতীয় কোন পদার্থ নেই। যাক্ আমার বউকে না খাওয়াতে চাও না খাওয়ালে আমাকে তো আর এক কাপ চা দাও। আচ্ছা দিদি, দাদা যদি বিলাতে বিয়েই করল কোন বিলিতি মেয়ে পেল না? সেই শাড়ি পরা বাঙ্গালী মেয়ে ছাড়া আর কিছু চোখে দেখল না? খাস

ব্রিটিশ না হোক অ্যাংলো ইটালিয়ান, অ্যাংলো সিসিলিয়ান, অ্যাংলো হাঙ্গেরিয়ান কাউকে না কাউকে তো পেতে পারত।'

'অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান বাদ দিলি কেন?'

'ওরে বাবা, দাদা ওদের দারুণ ভয় করে। একবার এক বুড়ী অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেম ট্রামে দাদাকে আচ্ছা করে ধমকে দিয়েছিল।'

দাড়ি কামানো শেষ করে প্রফুল্লবাবু তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকলেন। দিলীপের বিয়ের ব্যাপারটাকে সবাই কত সহজে নিয়েছে। এর মধ্যে যে সত্যভঙ্গের একটা গুরুতর অপরাধ আছে, নির্মম হৃদয়হীনতা রয়েছে সে দিকটা যেন কারোরই নজরে আসছে না। না কি ইচ্ছা করেই এ দিকটা ওরা এড়িয়ে যাচ্ছে?

লতিকার কি সত্যিই সাধনা মুখার্জির মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ করায় অনিচ্ছা ছিল? লতিকা কি সাধনা সম্বন্ধে সত্যিই জেলাস? নাকি ওটা ওর নিছক হাসি ঠাট্টা? সাধনার বয়সও অবশ্য চল্লিশ পার হয়ে গেছে। কিন্তু চেহারায় বয়স ধরা যায় না। তাছাড়া টিপ-টপ থাকে। কালো পেড়ে সাদা খোলের শাড়িই পরে। কখনো কখনো হাল্কা রং-এর শাড়িও যে না পরে তা নয়। হাতে দুগাছি চুড়ি, গলায় সরু এক গাছি হার। এ ছাড়া কোন গয়না গাটি নেই। চুল গোছায় বড় কিন্তু দৈর্ঘ্যে ছোট। সাধনা তা আরো ছেঁটে নিয়ে কাঁধ পর্যন্ত রেখেছে। ভালোই দেখায়। ওর চেহারার সঙ্গে মানিয়ে যায়। তাছাড়া সাধনা প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড অফিসে চাকরি করে। না করলে চলবেই বা কেন। স্বামী নাকি মোটা টাকা ইনসিওরেন্স রেখে গেছে। শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তির কিছু আয়ও পায় কিন্তু সাধনা শুধু তার ওপর নির্ভর করে না। এই স্বাবলম্বিতা ভালোই লাগে প্রফুল্লবাবুর। তাছাড়া কথায় বার্তায় আদব কায়দায় সম্পূর্ণ একটা ভিন্ন জগতের স্বাদ নিয়ে আসে সাধনা। প্রফুল্ল-বাবুর নিজের বাড়িতে এ ধরনের পরিবেশ নেই। আর দিলীপের মনোনীতা মেয়েটিও বেশ ভালো। যেমন সুশ্রী, তেমন উচ্চ শিক্ষিতা তেমনি সুকণ্ঠী। গেলে খুব আদর যত্ন করে। মাঝে মাঝে কাকা-বাবু বলে ডাকে প্রফুল্লবাবুকে। তিনি ভাবেন দুদিন বাদে সম্বোধন পাল্‌টে একেবারে বাবা বলতে হবে। ছেলের বাগদত্তা এই মেয়েটিকে গভীর স্নেহ করেন প্রফুল্লবাবু। তিনি ভাবেন

তাঁর ছেলে-মেয়েরা কেউ দেখতে সুন্দর নয়। কিন্তু এই মেয়েটি যখন বউ হয়ে তার ঘরে যাবে গোটা বাড়ি তার রূপের আলোয় ঝলমল করে উঠবে। দিলীপটা কী আহম্মক। এমন রূপবতী গুণবতী মেয়েকে ছেড়ে কোন খেঁদী পেঁচীকে ঘরে তুলেছে কে জানে। এমন মেয়ের পাত্রের অভাব হবে না। দিলীপের মত অমন ফার্স্টক্লাস ইঞ্জিনীয়ার সে আরো পাবে। চাই কি দিলীপের চেয়েও কৃতী গুণবান রূপবান ছেলেকে সে বেছে নিতে পারবে। কিন্তু দিলীপ যা হারাল সে ক্ষতি কি আর সহজে পূরণ হবে? হলেই ভালো।

অন্যদিন খেতে বসে স্ত্রী আর ছেলে মেয়েদের সঙ্গে কিছু না কিছু কথা বলেন প্রফুল্লবাবু। কিন্তু আজ অফিসের বেলা হয়ে গেছে। সময় নেই। মেজাজও নেই।

তাড়াতাড়ি খেয়ে উঠে অফিসের ধরা চূড়া পরে তৈরি হয়ে নিলেন। লতিকা টিফিনের বাক্সটি স্বামীর হাতে দিলেন। সদর দরজা পর্যন্ত পিছনে পিছনে এসে বললেন, 'মন খারাপ করো না। এ ব্যাপারে তোমার আমার তো কিছু করবার নেই। ছুটির পরে সোজা বাড়ি চলে এসো। এসো কিন্তু।'

প্রফুল্লবাবু বললেন 'আচ্ছা'।

২

ছেলের চিঠি পেয়ে লতিকারও কি মন খারাপ হয়নি! খুবই মন খারাপ হয়েছে। কিন্তু দিলীপের বাবার মত তিনি মনের কথা যখন তখন যার তার কাছে খুলে বলতে পারেন না। বলাটা পছন্দ করেন না। তিনি মনের দুঃখ নিজের মনেই বহন করতে জানেন। এইটুকু তাঁর বাবার কাছে শিক্ষা। বাবা বলতেন, 'সব সময় নিজের চিন্তা ভাবনা দুঃখ দুর্দশার বোঝা অন্যের ওপর চাপিয়ে দিসনে। তাতে অন্য লোক বিরক্ত হয়ে ওঠে। তাতে নিজের দুঃখের বোঝা কমে না বরং অন্য একটি বোঝা বেড়ে ওঠে। পাঁচ জনের অনুকম্পা ঔদার্য বিরক্তির বোঝা ভারি হতে থাকে।'

বাবা ছিলেন আদর্শবাদী হেডমাস্টার। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু কেউ

ছিলেন না। তা নিয়ে তাঁকে খুব হাহুতাশ করতে দেখা যায়নি। তিনি যে নিজের দুঃখ অশান্তি উদ্বেগ নিজেই বহন করতে পারেন, নিজে তার প্রতিকার করতেও জানেন এই ছিল তাঁর মনের প্রচ্ছন্ন গর্ব। দাদারা বাবার স্বভাব তেমন একটা পায়নি, বোনেরাও না। শুধু লতিকার স্বভাবটাই এদিক থেকে বাবার মত হয়ে গেছে।

লতিকা জানেন তাঁর ছেলেমেয়েদের ওপর ওদের বাবার প্রভাব যতখানি তার চেয়ে অনেক বেশি প্রভাব তাঁর। বিশেষ করে দিলুর। তাকে তো তিনিই হাতে করে গড়ে তুলেছেন। লতিকার নিজের বিদ্যা ম্যাট্রিকুলেশন অবধি। কিন্তু ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার খোঁজ খবর তিনি যতটা করেছেন ওদের বাবা তেমন করেন নি। কে কোন বিষয় নিয়ে পড়বে কার প্রবণতা কোন ধরনের তাও লতিকাই ঠিক করে দিয়েছেন।

ছেলেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ানো নিয়ে দিলুর বাবার মনে সংশয় ছিল। 'অত খরচ কি চালিয়ে উঠতে পারব?'

নামেই সরকারী চাকরি। পি ডাবলিউ ডিতে একটু উঁচু সিঁড়ির কেরাণীগিরি। তাতে তখন কতই বা মাইনে ছিল? কিন্তু লতিকা বললেন, 'ছেলেকে পড়াতেই হবে। ওর যখন মনের অত আকাঙ্ক্ষা। আমি তোমার সংসারী খরচ থেকে পনের বিশ টাকা বাঁচিয়ে দেব। না হয় এক বেলা মাছ না খাব। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং ছেলেকে পড়াতেই হবে। যদি না পড়াও তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।'

শিবপুরে ভর্তি হবার পর দিলু হাসি মুখে বলেছিল, 'মা তোমার জন্যেই আমার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াটা হল। শুধু বাবা থাকলে আমাকে সোজা হয়ত নিয়ে গিয়ে বি. এস সিতে ভর্তি করে দিতেন। তারপর পরিণামে বাবার মত কেরাণীগিরি কি মাষ্টারী—'

লতিকা বলেছিলেন, 'দূর তাই কি হয়? তোর বাবারও মনে মনে এই ইচ্ছাই ছিল। উনি শুধু সবারই কাছ থেকে সাহস ভরসা চান।' দিলু বলেছিল, 'মানে একটা ঠেকনা ছাড়া ওঁর ইচ্ছার গাছটা দাঁড়াতে পারে না বাড়তেও পারে না। তুমি ঠেকনা আর বাবা সেই হেলে পড়া গাছ।'

লতিকা হেসে বলেছিলেন, 'ফাজিল কোথাকার। তবু উনিই

গাছ। ওঁরই ফুল ফল ছায়া আছে। আমি একটা শুকনো বাঁশের ঠেকনা।'

বাবার সম্বন্ধে ছেলেমেয়েদের ধারণা যাতে খারাপ না হয়ে যায় সে ব্যাপারে লতিকা খুব সতর্ক।

দিলু বলেছিল, 'বাব্বা কী পতিভক্তি, অমনিতে দেখি ঝগড়া ঝাঁটি লেগেই আছে। আর যেই আমরা কিছু বলি সঙ্গে সঙ্গে দুজনে এক কাট্টা হয়ে যাও, বাবা মহীরুহ আর তুমি তার গা' বেয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে ওঠা সুবর্ণ লতিকা। নাও এবার হলতো?'

লতিকা হাসি চেপে ছেলেকে ধমক দিয়ে বলেছিলেন, 'মারব এক গাট্টা। তোর বাবা মহীরুহ নন কিন্তু তুই মহীরুহ হবি। অনেক বড় হবি দিলু।'

ছেলে সঙ্গে সঙ্গে লতিকার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল, 'মাথায় আমি সবাইকে ছাড়িয়ে গেছি মা। ঢের বড় হয়ে গেছি। পাঁচ ফিট সাত ইঞ্চি। আরো কত বড় দেখতে চাও।'

'আরো বড় দেখতে চাই। সত্যি সত্যি বড়।'

এই উচ্চাকাঙ্ক্ষার মন্ত্র তিনি সব সময় ছেলে-মেয়েদের কানে দিয়ে আসছেন। 'বড় হবি, ভালো হবি, দশজনে যাতে চেনে জানে মানে গোনে তেমনি হবি।'

'মা, এখনো তোমার রান্না শেষ হলনা।' সুমি এসে পিছনে দাঁড়িয়েছে।

লতিকা পিছনে ফিরে বসলেন, 'তুই নাইতে চলে যা না। আমার রান্নার সঙ্গে তোর কি সম্পর্ক?'

সুমি বলল, 'তবু তুমি সারাদিন রান্নাঘরে আটকে থাকবে ভাবতে ভালো লাগে না মা। তোমার ঠটি বটি ভাজা চচ্চড়ির যেন আর শেষ নেই।'

লতিকা বললেন, 'কী করব বল? আমি তো আর তোদের মত লেখাপড়া শিখিনি, বাইরে চাকরি বাকরি করতেও বেরোইনি। আমার এই কাজ।'

সুমি বলল, 'তাই বলে কি অতক্ষণ কেউ রান্নাঘরে থাকে; তুমি তো আমার দিদিমা নও। একালের মেয়ে না হলেও তুমিও একালের মা। এত করে বলছি গ্যাসটা আনিয়ে নাও। খুব তাড়াতাড়ি

রান্না হয়ে যাবে। বোসেদের বাড়িতে এসেছে, ব্যানার্জিদের বাড়িতে এসেছে। কেবল তোমরাই গ্যাস আনাতে তুতুবুতু করছ।'

তারপর হঠাৎ সুমির যেন কী মনে পড়ে গেল। হেসে বলল, 'দাদাও তো লণ্ডনে গ্যাসে রান্না করে। আগে রান্না বান্নার বর্ণনা দিত চিঠিতে। ওখানে কৌটায় ভরা রান্না করা খাবার পাওয়া যায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে এমন একটার পর একটা পদ রান্না করতে হয় না। দাদা লিখত নিজের রান্না নিজে করে নিতে ওর একটুও কষ্ট হয় না। এখন তো সব কষ্টই দূর হয়েছে। তাই না মা? বউদি বসে বসে বিলিতি উনুনে বিলিতি ধরণে বিলিতি খাবার রান্না করছে, তাই না মা? দাঁড়াও, এখন কি ওদের রান্না খাওয়ার সময়? হিসাব করে দেখি ওদের এখন টাইম কত। এখানকার চেয়ে সাড়ে চার ঘণ্টা শ্লো। তাহলে এখন হল এখানে পৌনে দশটা, ওদের এখনো ভালো করে ভোরই হয়নি মা।'

লতিকা বললেন, 'থাক তোর এখন বসে বসে হিসাব করতে হবে না। তোর বেলা হয়ে গেছে না? স্কুলে যেতে টেতে হবে না?'

সুমি বলল, 'আজ যেতে ইচ্ছে করছে না মা। ভাবছি কামাই করে দেব।'

লতিকা মুখ ভার করে বললেন, 'কেন মিছামিছি কামাই করবি। সার্ভিস রেকর্ড খারাপ হয়ে যাবে।'

সুমি বলল, 'ভারি তো প্রাইভেট স্কুলে একটা চাকরি। তার আবার সার্ভিস রেকর্ড।'

লতিকা বললেন, 'তবু বিনা কারণে কামাই করার অভ্যাসটা ভালো না। বাড়িতে বসে থেকে করবিই বা কি।'

সুমি একটু চুপ করে থেকে বলল, 'দাদার জন্যে মনটা ভালো লাগছে না মা।' লতিকা বললেন, 'দাদার জন্যে? নাকি নিজের বন্ধু সুতপার জন্যে? সত্যি কথাটা বললেই হয়।'

'তোমার খারাপ লাগছে না মা?'

'সে কথা বলে আর কি হবে? সবাই যদি বলতাম খারাপ লাগছে তাহলে তোদের বাবা পাগল হয়ে যেতেন। এমনিতেই যা শুরু করে দিয়েছেন। ওঁকে ঠিক রাখবার জন্যেই আমাকে শক্ত থাকতে হয়। এমন ভাব দেখাতে হয় যেন কিছুই হয়নি।'

সুমি বলল, 'কিন্তু বেচারা সুতপা। ওর কথাটা একবার ভেবে দেখ মা। দাদা যে এমন কাণ্ড করবে! ওদের কাছে আমাদের মুখতো খুব ছোট হয়ে গেল। দাদার কত গর্ব করি আমরা।'

লতিকা বললেন, 'কী জানি বাপু। তোমাদের এসব ব্যাপার কী করে বুঝব। আমার তো মনে হয় সম্পর্ক একদিনে যেমন গড়ে ওঠে না, একদিনে তেমনি ভাঙ্গাও যায় না। দিলু আমার ঝোঁকের মাথায় কিছু করে ফেলবার ছেলে নয়।'

সুমি একটু বিরক্ত হয়ে বলল, 'একদিন ফল ভোগ করবে মা। অনেকদিন ধরেই করেছে। এখানে যেমন ছিল সুতপা সেখানে তেমনি দেখেছে রীজাকে। একজনকে দেখে আর একজনকে ভুলে গেছে। তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছে, ভালোবেসেছে।' লতিকা বললেন, 'আমি কিছু বুঝতেই পারলাম না। কবে থেকে যে—'

'সে হিসাব করে কী হবে। এক বছরও হতে পারে আবার একমাসও হতে পারে। সে তোমার ছেলে। আমার ভাই। কিন্তু তাই বলে তার অন্যায়কে তো আর সমর্থন করতে পারিনে। কাজটা সে ভালো করেনি। একটি মেয়েকে চরম অপমান করেছে। চরম দুঃখ দিয়েছে।'

উনুন থেকে তরকারির কড়াটা নামিয়ে নিয়ে লতিকা বললেন, 'যা তুই এবার নাইতে যা। আমার সব রান্নাই নেমে গেল। ইদানীং সুতপার কথা চিঠিতে সে প্রায় লিখতই না। অথচ আগে লিখত মা তুমি ওদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখো। মিসেস মুখার্জিকে একদিন চা খেতে বলো। সুতপাকে আমাদের বাড়িতে এনে একদিন রেখো। কত কি লিখত। কিন্তু শেষ দিকের চিঠিগুলিতে ওসব কথা কিছুই থাকত না।'

সুমি বলল, 'থাকবে কি। সিংহাসনে তখন যে আর একজন এসে বসেছে।'

লতিকা একটু হেসে বললেন, 'তোর দেখি খুব রাগ। যা এবার নাইতে যা। আর দেরি করিসনে।' তিনি ফের তাড়া দিলেন মেয়েকে।

যেন বাথরুমে গিয়ে মগের পর মগ গায়ে জল ঢাললেই মনের রাগ মিটবে।

সুমি একখানা শাড়ি আর তোয়ালে নিয়ে বাথরুমে চলে গেলো। তেল সাবান সব সেখানেই আছে।

লতিকা এই ফাঁকে রান্নাঘরখানা একটু গুছিয়ে নিলেন। সুবীর সকালের খাবার খেয়ে সেই যে আড্ডা দিতে বেরিয়েছে আর সেই সাড়ে বারোটা একটার আগে ফিরবে না। দিলু বাপ-মাকে না জানিয়ে না শুনিয়ে বিয়ে করুক আর যাই করুক স্কুল কলেজে লেখা-পড়াটা মন দিয়েই করত। ওর ক্যারিয়ার ভালো। মনেও উচ্চ আকাঙ্ক্ষা আছে। বিলাত যাওয়ার স্বপ্ন ছিল। গিয়েও ছাড়ল। কোন বাধা-বিঘ্নকেই গ্রাহ্য করল না। অর্থের অনটন ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা কিছুই তাকে আটকে রাখতে পারল না। এখানে তো সে বেকার বসে ছিল না। সাতশ টাকার চাকরি ছেড়ে দিয়ে ও চলে গেল। অত টাকা ওর বাবা এখনো পান না। লণ্ডনে গিয়েও সে এক মাসের বেশি বসে থাকেনি। যোগ্য ছেলের যেমন অনেক মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ আসে দিলীপের হাতেও তেমনি বহু চাকরি এসেছে। ও নিজে সেগুলির ভিতর থেকে সব চেয়ে ভালোটিকে বেছে নিয়েছে। আরো ভালো অফার পেলে সেই অফিস ছেড়ে অন্য অফিসে জয়েন্ট করেছে।

কিন্তু সুবীরের ক্যারিয়ার ভালো হয়নি। ওর পড়া-শুনোয় মন নেই। শুধু সুবীর কেন পাড়ার বেশির ভাগ ছেলেরই এই অবস্থা। সবই প্রায় ওই দলে। ওরা নাকি নিজেদের ক্যারিয়ারের কথা ভাবে না। দেশের কথা ভাবে। দেশকে ঢেলে সাজাতে চায়। কিন্তু লতিকা ভেবে পান না ওরা নিজেরাই যদি যোগ্য না হতে পারল বড় হতে না পারল ওরা কার কি উপকার করবে। তুমি যে দশজনকে কিছু দেবে, দেওয়ার মত বস্তুতো তোমার থাকা চাই।

দিলীপকে এসব কথা লিখেছিলেন লতিকা। তার জবাবে দিলু লিখেছে, 'তুমি ভেবনা না মা। ও বি, এ, টা পাশ করুক। তারপর এখানে আমি ওকে নিয়ে আসব। নিজের কাছে রেখে পড়াব। কি কোন কাজ কর্ম শেখাব।' বিদেশে বসেও বাড়ির কথা দিলীপ ভাবে। ভাই বোন অন্ত তার প্রাণ। মনে যার অমন মমতা সে যে এমন একটা নিষ্ঠুর কাজ করে বসল তার মূলে কি

আর কিছু নেই? তার জন্যে কি দিলীপ একাই দায়ী? কে জানে, ওদের ভিতরের কথা ওরাই ভালো বলতে পারে। ছেলে-মেয়ে বড় হয়ে গেলে কি তাদের মনের কথা সব সময় বোঝা যায়। নাকি তারা বুঝতে দেয়?

নিজের পড়াশুনো আর ক্যারিয়ার ছাড়া আর অন্য চিন্তা ছিল না যে ছেলের সে গোগনে গোপনে আর একটি মেয়েক ভালোবাসে, তার সঙ্গে যে একটি আলাদা মধুর অম্পর্ক গড়ে তুলেছে, তাই কি লতিকা সহজে জানতে পেরেছিলেন না বিশ্বাস করেছিলেন?

আসলে বিশ্বাস করতে চাননি বলেই যেন বিশ্বাস করতে পারেননি।

দিলু যখন কলেজে পড়ত এমনকি কলেজ থেকে বেরিয়ে আসবার কিছুদিন পরেও লতিকাই ছিলেন যেন দিলুর একমাত্র বন্ধু। তাঁর কাছে ছেলে হস্টেলের দুষ্টু ছেলেদের গল্প করত; প্রফেসারদের গল্প করত; আরো যে কত বিবরণ কত বৃত্তান্ত সে মার কাছে করত তার যেন শেষ ছিল না। এই রান্না বান্না ছোট ঘর সংসারের জগৎ থেকে দিলু যেন তাঁকে এক সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতে নিয়ে যেত। এই স্বাদ দিলুর বাবা লতিকাকে দিতে পারতেন না। তিনি নিজের অফিস বাজারের ফর্দ, হিসাব নিকাশ, অবসর সময়ে বন্ধুদের বাড়িতে গিয়ে তাস খেলা এইসব নিয়েই থাকতেন।

সপ্তাহে একেবারে করে লতিকা যেতেন ছেলের হোস্টেলে। নিজের হাতে রান্না করে নিয়ে যেতেন মুড়িঘণ্ট, মাংসের স্টু, কোনদিন বা সন্দেশ পিঠে পায়েস। প্রথম প্রথম স্বামী যেতেন সঙ্গে। শেষের দিকে তাঁর আর সময় হয়ে উঠত না। সুমি সুবীরকে নিয়ে তিনিই যেতেন। যখন ওদেরও ডেকে পাওয়া যেত না লতিকা একাই যেতেন ছেলের সঙ্গে দেখা করতে।

মাকে দেখে দিলীপ খুব খুশি হয়ে উঠত।

'মা তোমার তো খুব সাহস। একা একা এসেছ ভয় করল না?'

'ভয় আবার কিসের?'

'বাঃ রে যদি হারিয়ে টারিয়ে যেতে!'

'আমি কি কচি খুকি নাকি? না পথ ঘাট চিনিনে? তুই ভাবিস আমি একেবারে গেঁয়ো মেয়ে। মুখ্যসুখ্যু।'

'দূর তা কে বলছে। সেদিন আমাদের পার্থ কী বলছিল জানো ?'

'কী বলছিল ?'

'তোমার আর আমার একসঙ্গে যে ফটোটা আছে, এই সেদিন বিনয়দা যেটা তুলে দিয়েছিলেন তাই দেখে আমার রুমমেট পার্থ বলেছিল ওঁকে তোর মা বলেতো মনেই হয়না দিলীপ। মনে হয় ছোড়দি টোরদি গোছের কেউ। কি বয়সে সামান্য বড় কোন বান্ধবী।'

লতিকা একটু লজ্জিত হয়ে বলেছিলেন, 'ফাজিল কোথাকার। যেমন তুই তেমনি তোর হতচ্ছাড়া রুমমেট, আসুক আমার সামনে আচ্ছা করে কান মলে দেব।'

মুখে স্বীকার করতেন না লতিকা। কিন্তু আসলে বড় হলে ছেলে তো বন্ধুর পর্যায়তেই ওঠে। সুখ দুঃখের ভাগ নেয়। নিজে থেকে বড় বড় উপদেশ দেয় পরামর্শ দেয়। মাঝে মাঝে ভাবতে অবাক লাগে সেই কোলের ছেলে যাকে তিলে তিলে রোজ বাড়তে দেখেছেন সে যেন হঠাৎ যুবক হয়ে গেছে। মাঝখানের দিন মাস বছর সব একাকার হয়ে কোথায় যে বিলীন হয়েছে তার ঠিক নেই।

কোন কোন সমাজে তার বয়সী মেয়েদেরও ছেলে বন্ধু থাকে। লতিকা শুনছেন, একেবারে যে চোখে দেখেননি তাও নয়। কিন্তু লতিকার তেমন কোন দরকারই বোধ হয়নি। একান্ত অনুগত মায়া মমতায় ভরা ছেলে যাঁর আছে তাঁর আর অন্য বন্ধুতে দরকার কি।

দিলীপ নিজে পছন্দ করে তার শাড়ি কিনে দিত। কখন কোন শাড়ি পরে কোথায় যেতে হবে বলে দিত। এ ব্যাপারে প্রফুল্লবাবু মোটেই মাথা ঘামাতেন না। দিলীপের খুব খেয়াল ছিল। কথা না শুনলে ছেলে রাগ করত।

সুমি বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসেছে। নাইতে ওর বেশ সময় লাগে। কিন্তু যে দিন এমনিতেই দেরি হয়ে যায় বেরোবার তাড়া থাকে সেদিন তো একটু তাড়াতাড়ি করা উচিত। মেয়ে যেন তাও পারেনা।

লতিকা আবার একটু মেয়েকে বকলেন, 'স্কুলের বেলা হয়ে

গেছে কখন। তুই আজ একটু তাড়াতাড়ি নেয়ে নিতে পারলি নে?'

সুমি হেসে বলল, 'তুমি ভেবনা মা। আমি ঠিক মেক আপ করে নিতে পারব। খেতে তো আমার পাঁচ মিনিটের বেশি লাগে না। শাড়িটা পরে আসি তুমি ভাত বাড়ো।'

চেয়ার টেবিলে খাওয়ার ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা বিলাতে যাবার আগেই দিলীপ করে গেছে। সোফা কোচে সেণ্টার টেবিলে ড্রয়িংরুম সাজিয়েছে। পুরোণ রেডিওটা বদলে নতুন রেডিও সেট কিনেছে। বাড়ির যা কিছু সংস্কার হয়েছে, যা কিছু আধুনিক সাজসজ্জা সব দিলীপের গরজে। ওর বাবা শুধু কাঁচা বাজারের পান মাছ তরকারিই চেনেন। অন্য কোন আসবাব পত্রের দিকে তেমন লক্ষ্য নেই। ভদ্রভাবে বাস করতে হলে মানুষের যে আরো জিনিস দরকার সেই বোধ এ বাড়িতে লতিকার আছে। ছেলেমেয়েদের মধ্যে বেশি আছে দিলীপের। যেমন তেমন ভাবে বাস করলেই হয় না। বাসগৃহকে সুন্দর আর সুসজ্জিত করা দরকার। বাইরের কোন কুটুম্ব কেউ এলে তাঁরা যেন দুদণ্ড প্রসন্ন মনে বসতে পারেন। গৃহস্থের সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প-সল্প করে যেন যাওয়ার সময় মনে একটু আনন্দের স্পর্শ নিয়ে ফিরে চলে যান। ঘরতো শুধু কোন রকমে মাথা বাঁচাবার জায়গাই নয়। ঘর আনন্দ নিকেতন। সেই আনন্দ গৃহসজ্জায় ফুটিয়ে তোলা চাই। এদিক থেকে তাঁর সঙ্গে দিলীপের খুব মিল, রুচির মিল।

সুমি এসে টেবিলে খেতে বসল।

'দাও মা কী হয়েছে দাও।'

'সবই রান্না হয়েছে। তুমি কী খাবে বল।'

সুমি বলল, 'দয়া করে তোমার চচ্চড়ি টচ্চড়ি আর দিয়ো না।'

ডাল ভাজা আর মাছের ঝোল এই দিয়ে তাড়াতাড়ি খেয়ে উঠল মেয়ে। পাঁচপদ দিয়ে খেতে শিখল না। পাঁচটা পদ রাঁধতেও শিখল না। শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে এ মেয়ের যে কী গতি হবে কে জানে।

মেয়েকে সদর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন লতিকা। বললেন, 'সকাল সকাল বাড়ি ফিরিস—ওমা আজ আবার ওই শাদা খোলের

শাড়ীটা পরলি।'

সুমি বলল, 'আমার রঙ তো তোমাদের মত ফর্সা নয় মা। সব রঙ কি আমাকে মানায়?'

লতিকা বুঝতে পারলেন, মেয়ের আজ মেজাজ ঠিক নেই।

লতিকা বললেন, 'স্কুল থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে আসিস। আজ আর কোথাও দেরি করিসনে।' সুমি বলল, 'কোথায় আর দেরি করব মা। যাওয়ার মধ্যে যাইতো এক সুতপার কাছে। এখন থেকে সে পথও বন্ধ হল।'

তিনি আর কিছু বললেন না। রাস্তার মোড়ে যতক্ষণ পর্যন্ত সুমি অদৃশ্য না হয়ে গেল তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। দিলীপের এই নিষ্ঠুরতায় ও খুবই আঘাত পেয়েছে। বিশেষ করে সুতপা ওর ঘনিষ্ট বন্ধু। সুমিই তার সঙ্গে দাদার প্রথম আলাপ করিয়ে দিয়েছিল।

এ তো একটা বিশেষ ঘটনা। কিন্তু এ ছাড়াও মেয়ে আজকাল অল্পেই রেগে যায়। ওর মন মেজাজ প্রায়ই ভালো থাকে না। লতিকা বুঝতে পারেন কারণটা। স্বামীর সঙ্গে এই নিয়ে কথাবার্তাও তার হয়।

মেয়ের এবার বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। চেষ্টাতো অনেকদিন ধরেই চলছে। বেশ কিছুদিন বাদে বাদে দু তিনটে পার্টি এসে সুমিকে দেখেও গেছে। কিন্তু কেউ আর তেমন উচ্চবাচ্য করেননি। এক পার্টি যৌতুকের পণ পরিমাণ এমন চড়িয়ে দিল লতিকারা আর কাছেই এগোতে পারলেন না। আসলে ওদের করবার ইচ্ছা ছিল না। দিলুকেও তিনি মেয়ের বিয়ের কথা লেখেন। দিলীপ জবাব দেয়, 'বেশ তো সম্বন্ধ ঠিক কর টাকার জন্যে ভেব না।'

সম্বন্ধ ঠিক হয়েও হয় না। একটা দিক মেলেতো আর এক দিক মেলে না। মেয়ে লতিকার কালো তাই বলে সুমিকে অসুন্দর কেউ বলতে পারবে না। টানা নাক চোখ মুখের ডোলটুকুও মিষ্টি। তবু এই মেয়ের জন্যে একটি ভাল পাত্র পাচ্ছেন না লতিকা। এখন বিয়ের কথা শুনলেই সুমি চটে ওঠে। বলে, 'রাখো রাখো। ওসব কথা আমাকে কেউ আর বলতে এসে না। শুনে শুনে কান পচে গেল।'

মেয়ের বিরক্ত হবারই কথা। ওরও তো একটা মান অপমান বোধ আছে। আপন দুঃখ আর অভিমান আছে। এর চেয়ে মেয়ে যদি কাউকে ভালোবেসে বিয়ে করত লতিকা খুশি হতেন। কিন্তু তাঁর অমন বিদ্বান আদর্শবান ছেলে দু' তিনবার করে ভালোবাসায় পড়তে পারে আর তাঁর এই মেয়েটি তেমন কোন একটি যোগ্য ছেলেকে আকর্ষণ করতেই পারল না। অমন মুখচোরা গোবেচারা হলে কি চলে? অত ভালোও আবার ভালো না।

সদর দরজা বন্ধ করে দিয়ে আবার রান্নাঘরে ফিরে এলেন লতিকা। মিটসেফে খাবারগুলি ঢাকা আছে কিনা দেখে নিলেন।

এবার লতিকা নাইতে যাবেন। সারা বাড়িটা খালি। মনটা সত্যিই এখন কেমন যেন উদাস হয়ে যাচ্ছে। তাঁদের না জানিয়ে না শুনিয়ে দিলীপ তাহলে বিয়ে করেই ফেলল।

ছেলের এই বিয়ে নিয়ে স্বামীর সঙ্গে মাঝে মাঝে কত পরামর্শ করেছেন লতিকা। কত জল্পনা কল্পনা করেছেন লতিকা।

'ভালোবেসেই বিয়ে করুক আর যাই করুক ছেলের বিয়েতে তুমি কিন্তু কৃপণতা করতে পারবে না।' প্রফুল্লবাবু বলতেন, 'কৃপণতা করব কেন? তবে একটু চেপে চলতে হবে বইকি। মেয়ের বিয়ের খরচের কথা তো ভাবতে হবে।'

'তা ভাবো। কিন্তু ছেলের বিয়েতেও কাউকে ফাঁকি দিতে পারবেনা। আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব সবাইকে বলতে হবে।'

'তোমার যেমন বসুধৈবকুটুম্বকম—সবাইকে বলতে গেলে তো নিমন্ত্রিতের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে যাবে।'

'তা ছাড়ায় ছাড়াক। এতকাল ধরে যাদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেয়ে আসছি তাদের একবার নিজেদের বাড়িতে খেতে বলব না? লোকে ভাববে কি তা হলে।'

রণে ভঙ্গ দিতেন প্রফুল্লবাবু, 'ঠিক আছে। যখন হবার হবে। যাদের তুমি বলবার তুমি বলবেই। হাজারই হোক আর দেড় হাজারই হোক।'

লতিকা এবার এগিয়ে এসে সত্যিই লতার মত স্বামীকে জড়িয়ে ধরতেন, 'রাগ করছ নাকি? রাগ করো না। এ কি ঝগড়া ঝাটির ব্যাপার? এ হল উৎসব আনন্দ। হিসেব করে তো জীবনভোরই

চললাম। একবার বোহিসেবী হবার সুখ বুঝি পেতে ইচ্ছা করে না? কত ভাবে কত রকম ভাবে টাকা নষ্ট হয়। তুমি তো তা করনি, ছেলের বিয়েতে আমরা ইচ্ছামত খরচ করব। তাই বলে বউভাতে হাজার দেড়হাজার লোক আর হবে না। ছয় সাতশোর মধ্যেই থাকবে।'

তারপর গয়না গাটির কথা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সুন্দরী বউ যখন আসছে তাকে সুন্দর করে সাজাতে হবে। সাধনাদি যেন তাঁকে কৃপণ না ভাবেন। বউকে হার দেবেন বালা দেবেন কাণের জন্যও রিঙ একটা দেবেন মনে মনে ভেবে রেখেছিলেন। মেয়েকে নিয়ে গয়নার ডিজাইন কতবার পছন্দ করতে বসেছেন। সুমি অবশ্য গয়না টয়না তেমন পরে না। কিন্তু মেয়ে যাতে অন্য কিছু না ভাবে তাই লতিকা আগেই বলেন, 'আমি যা গড়াব তা দুসেট করে গড়াব। এক সেট তোর জন্যে আর এক সেট সেই বউয়ের জন্যে।'

বউ ভাতের জন্যে শ্যামবাজারের দিকে একটা আলাদা ভাড়া নেবেন। সকাল থেকে সেখানে সানাই বাজবে। এখন তো আর বিয়েতে ঢুলী-টুলির চলন নেই। লতিকার বিয়ে হয়েছিল গাঁয়ের বাড়িতে। বাবা নাম করা বড় এক ঢুলীর দল এনেছিলেন। ছ'জন লোক ছিল সেই দলে।

দিলু তাঁর কোন সাধ মিটতে দিল না। বাদ্য বাজল না, বাজি পুড়ল না, লোকজন খেলনা, আত্মীয় স্বজন কেউ এল না, আনন্দ উৎসব কিছুই হলনা। শুধু একটি লাইনে সব শেষ করে দিল, 'মা আমি বিয়ে করেছি।'

তারপর বিয়ে করেছিস তো বাপু একটি কায়েতের মেয়েকে। আজকাল অবশ্য বামুন কায়েতে বিয়ে হয়। অত কড়াকড়ি আর নেই। তবু আত্মীয় স্বজনের কাছে লতিকাকে একটু জবাবদিহিতো করতেই হবে। লতিকার এক জেঠা এখনো বেঁচে আছেন, ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী জপ করেন। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। এ কথা শুনলে তিনি লতিকার বাড়িতে জলগ্রহণই আর করবেন না।

তারপর বেচারা সুতপা, ও মেয়েটাও দুঃখ পাবে বই-কি। প্রথম যে দিন সুমি তাকে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে আসে, তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয় ওকে ভালো লেগেছিল লতিকার। ভালো না

লাগবার কী আছে। লম্বার ওপর সুন্দর গড়ন শরীরের। গায়ের রংও বেশ ভালো। একেবারে ফ্যাকাশে ফর্সা নয়, লালচে ধরণের। মুখশ্রী সুন্দর। মাথায় এক গোছ চুল আছে। না কোন খুঁৎ চোখে পড়েনি লতিকার। এমন রূপ কার না পছন্দ হয়। তারপর গুণও আছে। তখন হিষ্ট্রিতে অনার্স নিয়ে পড়ছিল সুতপা। পড়াশুনোয় ভালো। গান গাইতে পারে। তেমন যত্ন নিয়ে অবশ্য শেখেনি। তবু গলাটা মিষ্টি। এমন মেয়েকে পছন্দ না করবার কি আছে ?

ওর আড়ালে সুমি বলেছিল, 'দাদার সঙ্গে বেশ মানায়। তাই না মা ?'

লতিকা বলেছিলেন, 'মানায় তো। কিন্তু অমন মেয়ের কি তোর দাদাকে পছন্দ হবে ? তোর দাদা তো দেখতে সুন্দর নয়।'

সুমি বলেছিল, 'আহা দাদা কি আমার ফেলনা নাকি ? দাদা কত গুণী কত বিদ্বান। শোন মা। তুমি নিশ্চিন্ত হতে পার। ওরা দুজনেই দুজনকে পছন্দ করেছে।'

সুমি হেসেছিল।

মেয়েটির সম্বন্ধে আর কোন অভিযোগ ছিল না লতিকার। শুধু ওর মার একটু মেমসাহেবী ঢং আছে। আর সাধনার একটু নাক উঁচু ভাবও লক্ষ্য করেছেন লতিকা। কিন্তু তাতে কী এসে যায় ? হাজার হলেও লতিকা ছেলের মা। মেয়ের মার অহঙ্কারে তাঁর কী এসে যায় ?

মেয়েরও একটু চাপা অহঙ্কার আছে। সুতপার সঙ্গে আরো বেশি আলাপ পরিচয় হবার পর লতিকা সেটুকু লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু অত যার রূপ গুণ তার তো কিছু দেমাক থাকবেই। তা ছাড়া মেয়েটি বড় চাপা। খুব কম কথা বলে। লতিকার সঙ্গে বেশি কথা সে কোনদিন বলেনি। লজ্জাও হতে পারে। বিয়ের আগে ভাবী শাশুড়ীর কাছে সঙ্কোচ তো থাকবেই। সব চেয়ে বড় কথা ওরা পরস্পরকে পছন্দ করেছে।

একদিন ছেলেকে ধরে ফেলেছিলেন লতিকা।

অফিস থেকে ফিরে এসেছে দিলু। লতিকা ছেলেকে চা টা দিচ্ছেন। সেদিন ওর বন্ধুরা কেউ সঙ্গে নেই।

সুমি আর সুবীরও যেন কোথায় গেছে।

ঘরে শুধু তিনি আর দিলু।

ছেলের কাঁধে একখানি হাত রেখে মৃদু হেসে লতিকা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'হ্যাঁরে, তুই যে বলেছিলি তোমাকে ছাড়া আর কাউকে ভালোবাসি নি। এখন কী হল? কবে চুপি চুপি এসব কাণ্ড করলি বল তো?'

ছেলে প্রথমে স্বীকার করতে চায়নি। যেন কিছুই হয়নি, কিছুই জানে না মুখে তেমনি একটা বোকা বোকা ভাব এনে বলেছে, 'কিসের কথা বলছ মা! আমি কিছুই বুঝতে পারছিনে।'

'দুষ্টুমি হচ্ছে। কিছুই তুমি বুঝতে পারছ না! সুতপা বলে কাউকে চিনিস?'

দিলীপ বলেছে, 'একটি মেয়ে বোধহয়। তাই না মা?'

'ফাজিল কোথাকার। একটি মেয়ে কিনা তাও তুমি জানো না?'

দিলীপ জবাব দিয়েছে, 'আমি আর সামান্য একটু বেশি জানি। সুমির বন্ধু। বাচ্চা মেয়ে।'

লতিকা হেসে বললেন, 'হুঁ বাচ্চা। আর তুমি তার অতি বৃদ্ধ ঠাকুরদা। হ্যাঁরে কবে এসব হল বল্ না আমাকে প্রথম থেকে। কলেজের কত গল্প করেছিস, হস্টেলের কত গল্প করেছিস, অফিসের কত ব্যাপার নিয়ে কত কথা বলেছিস, কিন্তু একথা তো কোনদিন বলিসনি।'

দিলু হেসে তাঁর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। কোন জবাব দেয়নি।

'আমি তো ভাবতাম তুই কোন মেয়ের মুখের দিকে তাকাতে পারবি নে। তোর যা লজ্জা!'

'আজও তাকাতে পারিনে মা।'

'না পার না। বিনা তাকানোতেই সব হয়েছে। কী ভাবে কী হল বল না।'

দিলু হার মেনে বলেছে, 'কী ভাবে ওসব আসে তা বলা যায় না মা।'

আজ দিলু সামনে থাকলে লতিকা জিজ্ঞাসা করতেন, 'কীভাবে যে ভালোবাসা চলে যায় তাও কি বলা যায় না?'

কথাটা ওর মুখ থেকে শুনতে ইচ্ছা করছে লতিকার। ওর মুখখানা বড় দেখতে ইচ্ছা করছে।

৩

বাড়ি থেকে বেরিয়ে সুমি হাতের ঘড়িটার দিকে তাকাল। এগারটা প্রায় বাজে। স্কুল কাছেই। এখনো যদি সঙ্গে সঙ্গে বাসটা পাওয়া যায় দশ বার মিনিটের মধ্যেই লেক টাউনে পৌঁছে যাবে। বেশি দেরি হবে না। হেডমিস্ট্রেসকে একটু বলে নিলেই হবে। তা ছাড়া প্রথম ঘণ্টায় তার কোন ক্লাস নেই। ছাত্রীদের কোন অসুবিধা হবে না। কিন্তু হেডমিস্ট্রেস কমলা সেন গোমড়া মুখে বলবেন, 'তুমি আজও দেরি করে এলে সুমি। সাড়ে দশটায় অ্যাটেনড্যানস আর তুমি এগারোটায় এসে হাজির হলে! এই ইরেগুলারিটি তো ভালো না।'

হেডমিস্ট্রেস তাকে ভালো চোখে দেখেন না। তার অ্যাটেন-ড্যানসে, তার চাল চলনে অনেক খুঁৎ বার করেন। কিন্তু সুমিকে ছাত্রীরা পছন্দ করে, অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট হেডমিস্ট্রেস কেতকী দত্ত তাকে পছন্দ করেন, সুমির কলীগ রমা বীণা তাকে ভালোবাসে।

হেডমিস্ট্রেসের বিরোধী দলটিকেই সেক্রেটারী প্রশ্রয় দেন। তাই সুমি এই স্কুলে টিঁকে আছে। নইলে হেডমিস্ট্রেস তাকে তাড়িয়ে ছাড়তেন। তাড়াতে পারেন না, কিন্তু ছোটখাটো অজুহাতে তিনি সুমিকে ধমকান, নানারকম খারাপ ব্যবহার করেন। ভালো লাগে না সুমির। শুনেছে শ্বশুরবাড়িতে কারো কারো এমন খাণ্ডারণী শাশুড়ী জোটে। সুমির তো এখন পর্যন্ত শ্বশুরবাড়ি হল না। কিন্তু দেখ একটি শাশুড়ী ঠিক জুটেছে। আর বাড়িতে আছেন মা। কর্তব্যপরায়ণা এই মহিলাটির জন্যে সুমি অস্থির। সুমি যখন স্কুলে পড়ত তখনও যেমন তাগিদ দিয়ে স্কুলে পাঠাতেন, একদিনও কামাই করতে দিতেন না এখনো তেমনি। সুমি স্কুলের ছাত্রী থেকে টিচার হয়েছে, কিন্তু মা যেমন ছিলেন তেমনি আছেন। একদিন কামাই করলে কিছু এসে যায় না। এ কথা তাঁকে কিছুতেই বোঝানো যাবে না।

'শরীর যখন ভালো আছে স্কুলে যাবিনে কেন।' শরীর ভালো থাকাই যে সব না, মানুষের মন মেজাজ বলেও যে একটা পদার্থ আছে একথা মাকে কে বোঝাবে।

বাসে উঠেই সুমি স্থির করে ফেলল আজ স্কুলে যাবে না। দেরি করে গিয়ে অনর্থক হেডমিস্ট্রেসের কথা শুনে লাভ কি। তার চেয়ে সুতপাদের ফ্লাটে গিয়ে আড্ডা দেওয়া ভালো।

ওরা কাছেই থাকে। পাতিপুকুরের সরকারি হাউসিং ষ্টেটের একটি ফ্লাট নিয়ে আছে ওরা। স্কুল থেকে ফেরার পথে প্রায়ই এখানে এসে গল্প করে চা খেয়ে তবে বাড়ি যায় সুমি।

কিন্তু দাদা যা কাণ্ড করে বসল তাতে কি সুতপাদের সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক থাকবে!

বাস থেকে নেমে দক্ষিণমুখে ফ্লাটগুলির দিকে হাঁটতে হাঁটতে সুমির মন ফের বিষণ্ণ হয়ে উঠল। সুতপার কাছে এত তাড়াতাড়ি এল কেন সুমি? আজই কি সে তার বন্ধুকে এই নিষ্ঠুর নির্মম সত্যটা জানিয়ে দেবে? নাকি আকারে ইঙ্গিতে জানতে চাইবে সুতপা নিজে কিছু জেনেছে কিনা। সুতপা ভারি চাপা মেয়ে। ওকি আগে মুখ খুলবে! তবু মেয়ে বন্ধুদের মধ্যে সুমিই তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ। তার কাছে সুতপা যত মনের কথা বলেছে তত আর কাউকে বলেনি। সুমি তার যৌবন তার গুণ যোগ্যতা দিয়ে কোন ছেলেকে আকর্ষণ করতে পারেনি। হ্যাংলার মতো সে চেষ্টাও করে নি। অনেক মেয়ে আছে যারা গায়ে পড়ে ছেলেদের সঙ্গে ঘনিষ্ট হতে যায়। সুমির তাতে আত্মমর্যাদায় বাধে। আমি আছি। তুমি আমাকে খুঁজে নাও, আমাকে আবিষ্কার কর। যদি না পার সে তোমারই অক্ষমতা।

তিনতলায় ফ্লাট। নেম প্লেটে যাঁর নাম, সুমি শুনেছে সম্পর্কে তিনি মামা হন সাধনা মাসীর।

বেল টিপতে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন, অবশ্য অপরিচিত কেউ নন। সুমি ওঁকে চেনে। সুতপার দাদু। সাধনা মাসীর মামা হন এই সম্পর্কে। রিটায়ার করার পর কিছুদিন ধরে এখানে আছেন। দীর্ঘাঙ্গ সৌম্য দর্শন ভদ্রলোক সদালাপী। উনি সুতপার দাদু। তাই সুমিরও দাদু। হাসি মুখে বললেন,

'ও তুই ! আমি ভাবলাম তপুই বুঝি তাড়াতাড়ি ফিরে এল ।'

সুমি একটু হতাশ হয়ে বলল,' সুতপা বাড়িতে নেই !'

'না। ও বৃটিশ কাউনসিলে বই বদলাতে গেছে। খেয়ে দেয়ে বেরোয়নি। এক্ষুণি ফিরবে। বলে গেছে দাদু তুমি কিন্তু আগে থেকেই খেয়ে নিয়োনা। আমি না আসা পর্যন্ত আমার ভাত নিয়ে বসে থাকবে। কী হুকুম দেখেছিস। যেন ওই কর্তা আমি গিন্নী। আয় ভিতরে আয়।'

সুমি বলল, 'মাসীমাও তো নেই।' দাদু বললেন, 'সে তো অফিসে বেরিয়েছে। ছ'টার আগে ফিরবে না। আমি আর সুতপাই এখন ঘর-সংসার আগলাই। সুতপা কর্তা আমি গিন্নী। আয় ভিতরে আয়।'

সুমি একটু ইতস্তত করে ভিতরে ঢুকল।

দাদুর দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'আপনি ইচ্ছা করলে খেয়ে নিতে পারেন দাদু। আজকালকার গিন্নীরা স্বামীর জন্যে অমন করে অপেক্ষা করেনা। তারা আগেই খেয়ে-টেয়ে নেয়।'

দাদু বললেন, 'আমি তো দিদি তোদের মত একেলে নই সেকেলে গিন্নী।

সুমি বলল, 'আপনি সেকেলে একথা কে বলে ?'

'সেকেলে নই ? নইলে কি অফিস থেকে রিটায়ার করিয়ে দেয় ? তবু তো দু'বছর একস্‌টেনসনে ছিলাম। বোসনা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছিস কেন।'

প্রথম ঘরখানা বসবার। সোফা সেটে সাজানো। কাচের আলমারিতে বই। একধারে একটি কেসের মধ্যে বেহালা। সুমি জানে এটি দাদুর নিজের বাদ্যযন্ত্র। সন্ধ্যার পর তিনি এই যন্ত্রটি নিয়ে বসেন। নিজের মনে বাজান।

সুমি বলল, 'দাদু আমি আপনার কাজের ব্যাঘাত করলাম। আমি বরং যাই।'

দাদু বাধা দিয়ে বললেন, 'আরে না না আমার আবার কাজ কিসের। আমি তো বেকার। কোথায় যাবি এই দুপুর রোদে টো টো করতে ? বোস, সুতপা এক্ষুনি এসে পড়বে। ওর কথার নড় চড় হয় না। অবশ্য ট্রাম বাসের যা অবস্থা তাতে এখানকার

তরুণ তরুণীরা কী করে তাদের অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট ঠিক রাখে আমি ভাবি।'

সুমি হেসে বলল, 'আপনি ওসব কথাও ভাবেন!' দাদু তার উল্টো দিকের সোফাটায় বসলেন। পরনে ধুতি, গায়ে গেঞ্জি। মাথার চুলে অল্প পাক ধরেছে। কিন্তু শরীর এখনো বেশ শক্ত। মনে হয় ভদ্রলোককে সকাল সকাল রিটায়ার করিয়ে দেওয়া হয়েছে। উনি এখনো বেশ কাজ করতে পারেন।

দাদু বললেন, 'ভাবি বইকি। তবে তোদের মত ভাবিনে। কিন্তু অতিথি এসেছে ঘরে। ঘরে তো নয় তাকে একেবারে ধরে ঘরে নিয়ে এসেছি। কি দিয়ে আপ্যায়ন করি? এক কাপ কফি করে দেব তোকে?'

সুমি লজ্জিত হয়ে বলল, 'কী যে বলেন দাদু। সুতপা দেখি সত্যিই আপনাকে গিন্নী বানিয়ে ফেলেছে। কফি যদি খেতে চান বলুন আমি করে দিই।'

দাদু মাথা নেড়ে বললেন, 'উঁহু। তুমি যদি চাও তাহলে আমি করে দেব।' তারপর সুমির দিকে চেয়ে একটু হেসে বললেন, 'সুতপা আমাকে গিন্নী বানায়নি রে, বহুকাল ধরে আমি নিজেই নিজের গিন্নী হয়ে রয়েছি।'

সুমি বলল, 'গিন্নী হবেন না তো কী করবেন? সময়মত বিয়ে করেননি। এখন বুঝুন মজা। থাকুন অর্ধনারীশ্বর হয়ে।'

দাদু হাসিমুখে চুপ করে রইলেন। সুমি বলল, 'আচ্ছা দাদু কেন বিয়ে করলেন না?' দাদু হেসে বললেন, 'এইরে তুই একেবারে গোড়ার ঘরে ফিরে গিয়েছিস। এতকাল পরে ওই পুরোন প্রশ্নের জবাব কি আর মনে আছে? মুখস্ত করা বিদ্যা সব ভুলে গেছি।'

সুমি হেসে বলল, 'আপনার স্মৃতিশক্তি তো খুব দুর্বল।'

দাদু বললেন, 'তাতে আর সন্দেহ কি। তবে কোন কোন সময় ভুলে যেতে পারাটা বলেরই পরিচয়।' সুমি হাসল।

'তাই নাকি? আপনি তাহলে বলবান বীরপুরুষ?'

'এখন কি আর হিরো বলে কেউ পছন্দ করবে? Fool, clown! তুই বোস আমি ততক্ষণে স্নানটি সেরে নি। সুতপা এসে যদি দেখে আমি না নেয়ে টেয়ে তোর সঙ্গে বসে গল্প করছি তো ভীষণ

চটে যাবে। তুই সুতপার ঘরে গিয়েও বসতে পারিস। ওর ঘরও খোলাই পড়ে আছে। ওরা কেউ চাবি টাবি দেয় না।

সুমি বলল, 'না আমি এই ঘরেই বসছি। আপনি বরং চান করে নিন। আর দেরি করবেন না।

'যথা আজ্ঞা' বলে তিনি ভিতরে চলে গেলেন।

সুমি ভাবল বেশ মানুষটি। যদিও বুড়ো তবু ওঁর সঙ্গে কথা বলে আনন্দ হাসি ঠাট্টায় সময়টা কেটে যায়। মনের অন্যসব চিন্তা ভাবনা সাময়িকভাবে চাপা পড়ে। এই মুহূর্তে দাদু যেমন দাদাকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছেন।

সুমি শুনেছে ওঁর নিকট আত্মীয় কেউ নেই। ঘুরে ঘুরে বেড়ান। যে যখন ডাকে তার কাছে গিয়ে থাকেন। তবে কারো বোঝা হন না। পেনসনের মোটা টাকা আছে। লোকে অর্থের অভাবে ঘর সংসার করতে পারে না আর উনি সামর্থ্য থাকতেও কেন এই আধা সন্ন্যাসীর জীবন বেছে নিলেন কে জানে?

বিবাহিত নারী পুরুষের চেয়ে এই সব অবিবাহিত স্ত্রী পুরুষ সুমির বেশি কৌতূহল আকর্ষণ করে। একটু চেষ্টা করলে জানা যায় এদের প্রত্যেকের জীবনেই কিছু না কিছু ইতিহাস আছে। এই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের নাম প্রাণবল্লভ চৌধুরী। বড্ড সেকেলে নাম। ওঁর বয়সের পক্ষেও সেকেলে। উনি সত্যিই কারো প্রাণবল্লভ হতে পেরেছিলেন! জিজ্ঞেস করতে হবে। সেই মহিলাটি ওঁকে কী বলে ডাকতেন। প্রাণ না বল্লভ? নাকি অতবড় নামের পুরোটাই বলতেন! না ওগো হ্যাঁগো বলেই কাজ চালিয়ে দিতেন!

সুতপা ঘরে তালা দিয়ে যায় না তা জানে সুমি। ইচ্ছা করলে ওর ঘরে গিয়ে সে এখন একটু গড়িয়ে নিতে পারে। সুমির মত ঘনিষ্ঠ বন্ধু তো তার নেই। তবু সুমির কেমন যেন একটু সঙ্কোচ লাগে। যে উপস্থিত নেই তার ঘর ব্যবহার করতে সুমির ভালো লাগে না। সুমি নিজেও চায় না তার ঘরে কেউ থাকুক। নিজের প্রাইভেসী সে নষ্ট হতে দিতে চায় না।

সুতপা একদিন হেসে বলেছিল, 'তুইতো কাউকে ভালো-ব্যাসিসনি। তোর অত গোপনতা কিসের?

'গোপনতা কি শুধু ভালোবাসার মধ্যেই থাকে?' সুতপা

বলেছিল, 'আর তো থাকে চুরি জোচ্চুরির মধ্যে। তুই কি তাই কিছু করেছিস নাকি?'

গুপ্ত প্রণয় আর গোপন অর্থ সংগ্রহ ছাড়াও মানুষের গোপনীয়তা থাকে। সে গোপনতা তার নিজেকে ঘিরে। নিজের চিন্তা ভাবনা ধ্যান ধারণা আশা আকাঙ্ক্ষার জগতে মানুষ নিজে একক ভাবে বাসা করতে চায়। সেখানে কারো হস্তক্ষেপ, কারো অনধিকার প্রবেশ সে পছন্দ করে না। নিজের বইপত্র কলম পেন্সিল টয়লেটের জিনিস যেন সেই চিন্তা ভাবনার প্রতীক। গোপন সব সিম্বল। তাই ওসব নিয়ে কেউ যদি টানাটানি করে সুমি ভারি চটে যায়। আর তাকে চটাবার জন্যেই সুবীর কোন কোন দিন তার ঘড়িটা নিয়ে বেরোয়, কোনদিন বা তার রুমালটা নিয়ে চলে যায়। সুমি যদি কিছু বলে সুবীর জবাব দেয়, 'তুই ভারি স্বার্থপর দিদি। তোর কোন জিনিস ছোঁয়া যায় না।'

সুবীর ছেলে মানুষ। ওকে ঠিক বোঝানো যাবে না এর নাম স্বার্থপরতা নয়। একান্ত ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনার মত এই ব্যক্তিগত ব্যবহারের জিনিসগুলিও যেন একান্ত গোপন বস্তু। অন্য কারো স্পর্শ অন্য কারো দৃষ্টি যেন তারা সহ্য করতে পারে না।

এত গোপনতা ভালোবাসে সুমি; এত আড়াল করতে ভালোবাসে নিজেকে অথচ বাইরের দিক থেকে দেখতে গেলে তার গোপন করবার কিছু নেই। 'তোমার গোপন কথাটি সখি রেখো না মনে।'

সুমির গোপন কথা কী? না, গোপন কথা বলে কিছু নেই। গোপন কথা বলে যদি কিছু থাকে তা আছে নিভৃত আকাঙ্ক্ষায়।

সুতপার দাদু প্রাণবল্লভ চৌধুরী কেন বিয়ে করেননি কেউ জানে না। অন্তত সুমি জানে না। কোন প্রণয় উপখ্যান এর পিছনে থাকতে পারে আবার নাও পারে। সবই সুমির অনুমান। সুমিও যদি বিয়ে না করে তাহলেও তো কেউ কেউ তার অতীত জীবন নিয়ে নানা জল্পনা কল্পনা করবে। একটি ব্যর্থ প্রণয়ের কাহিনী এর পিছনে দাঁড় করাবে।

কিন্তু সবই মিথ্যা। মা ভাবেন কালো মেয়ে বলে, শান্তশিষ্ট বলে সুমি কাউকে আকর্ষণ করতে পারেনি। যখন বিয়ের সম্বন্ধ

এসে ফিরে গেছে মা তখন এমন দু একটি কথা মাঝে মাঝে বলেছেন। কিন্তু মা তো জানেন না সুমি নিজেও কারো প্রতি আকৃষ্ট হয়নি। আকর্ষণ করবার মত কোন ছেলে দেখেনি। স্কুল কলেজে যাতায়াতের পথে পাড়ার চ্যাংড়া ছেলেদের কেউ কেউ তাকে বিরক্ত করেছে। দু একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক আসা যাওয়ার সময় দেখা হলে সুমিকে রাস্তার মধ্যে দাঁড় করিয়ে রেখে দু'চার মিনিট গল্প করেছেন। পিতৃবন্ধু কেউ কেউ বাড়িতে এসেও গল্প করেছেন, চা টা খেয়েছেন। তাদের কারো কারো চোখে সাময়িক মুগ্ধতার আবেশ স্পষ্ট হয়ে উঠতে দেখছে সুমি। কিন্তু ওই পর্যন্ত। এসব আলাপ আর এগোয়নি। দাদা তার বন্ধুদের বেশি বাড়িতে আনেনি। দু একজন যাদের এনেছে তারা সুমিকে এড়িয়ে গেছে। সুমিও যে তাদের সঙ্গে আলাপ করতে খুব আগ্রহ বোধ করেছে তা নয়। পড়লই বা তারা ইঞ্জিনিয়ারিং। পাশ করবার পর করলই বা ভালো চাকরি-বাকরি, তাহলেই যে তারা আদর্শ পুরুষ হবে তার তো কোন মানে নেই। মার হয়তো ওদের মধ্যে দু একজনকে জামাই করবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সুমির মনে তেমন কোন ইচ্ছা জাগেনি। তাই প্রত্যাখানের দুঃখ তাকে পেতে হয়নি। মনে মনে একটি শ্রেষ্ঠ পুরুষের স্বপ্ন দেখেছে। সুমির রূপ নেই, সুতপার মত তার গুণ যোগ্যতাও নেই। সে একজন অর্ডিনারি গ্র্যাজুয়েট। প্রাইভেট স্কুলের টিচার। কিন্তু বরমাল্য দিতে হয় তো সে একজন পুরুষ শ্রেষ্ঠকেই দেবে, ভালো যদি বাসতে হয় একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষকেই ভালোবাসবে। তার গোপনতা আছে উচ্চাকাঙ্ক্ষার মধ্যে।

সুমি নিজে কাউকে ভালোবাসেনি কিন্তু একটি ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে।

দাদা আর সুতপার মধ্যে সুমি আলাপ করিয়ে দিয়েছে। প্রথম প্রথম কোথাও বেড়াতে যেতে হলে কি সিনেমা টিনেমা দেখতে হলে ওরা সুমিকেও সঙ্গে নিত। সুমিকে মধ্যবর্তিনী রেখে ওরা পরোক্ষে কথা বলত। তারপর সুমি বুঝতে পারল ওরা মাঝখানে কাউকে আর রাখতে চায় না।

সুমির এতে রাগ হয়নি। বরং কৌতূহলই বোধ করেছে।

তার চেয়ে পাঁচ ছয় বছরের বড় অত গুরুগম্ভীর দাদা প্রেমে পড়ে কী ছেলেমানুষই না হয়ে গেছে। তার অত বিদুষী রূপবতী গুণবতী অভিজাত মনের সুতপা, বন্ধু কিন্তু সুমির দাদার সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের জন্য তার কী আকুলতা কী ছোট ছোট ছলনা চাতুরি মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ। সুতপা তার মাকে লুকোতে অন্য বন্ধুদের লুকোত সুমিকেও লুকোত। দাদাও তাই। দাদাও বাড়ির সবাইকে লুকোত। সুমির কাছেও সব কথা প্রকাশ করত না।

সুমি ওদের কাণ্ড দেখে মনে মনে হাসত। আর ভাবত দাদা কি ছেলেমানুষই না হয়ে গেছে। কোনদিন যদি সুতপা দাদার সঙ্গে হেসে কথা না বলত অমনি তার মুখ ভার হয়ে যেত। কোনদিন যদি সুতপা ওর সঙ্গে বেড়াতে যেতে না চাইত দাদার অসন্তোষের সীমা থাকত না।

কোনদিন বলত, 'সুমি ব্যাপার কি বলত? আজ ওদের বাড়িতে গেলাম সুতপা আমাকে যেন চিনতেই পারল না।'

সুমি ওকে সান্ত্বনা দিত, 'হয়তো মাসীমার সঙ্গে কথান্তর হয়েছে। সুতপা বড্ড মুডি। মন মেজাজ যদি একটু খারাপ থাকল বিশ্ব সংসারের কাউকে সে চিনতে পারে না।'

'তাই বলে আমাকেও স্বীকার করবে না।'

সুমি হেসে বলত, 'একবেলার জন্যে নাই বা করল। তুমিই বা একটি মেয়ের কাছে সব সময় স্বীকৃতি পাওয়ার জন্যে ব্যস্ত হচ্ছ কেন দাদা? তোমার কি আর কোন কাজ নেই? সুতপাই কি এখন তোমার একমাত্র জপতপ?'

দাদা স্বীকার করত। মৃদু হেসে বলত, 'প্রায় তাই। তুই কাউকে ভালো না বেসে ভালোই আছিস সুমি। ভালোবাসা মানেই একজনের অধীন হয়ে পড়া। আর সব অধীনতার চেয়ে খারাপ কোন মেয়ের অধীন হওয়া। একজন পুরুষের পক্ষে তেমন লজ্জার তেমন অগৌরবের তেমন যন্ত্রণার আর কিছু নেই। কিন্তু মুসকিল এই সেই suffering-এর ভিতর দিয়ে আমরা কেউ না গিয়েও পারিনে। বেঁচে থাকলে ভালোবাসার কষ্টও মানুষকে সহ্য করতে হয়।'

সুমি হেসে বলত, 'তোমার শ্মশানবৈরাগ্য কতক্ষণ থাকবে

দাদা ? পাঁচ মিনিট না সাত মিনিট ? ভালোবাসায় শুধু কি কষ্টই আছে দাদা ? তোমার কাণ্ড দেখলে তাতো মনে হয়না ।'

ভালোবাসার যন্ত্রণার কথা সুতপা অন্যভাবে অন্য ভাষায় ব্যক্ত করত ।

'তোর দাদা বড় অবুঝ । মাঝে মাঝে এমন পাগলামি করে ।'

কিসের পাগলামি কিসের অবুঝপণা তা সুমিকে অনুমান করে নিতে হত ।

ইংল্যাণ্ড গিয়ে দাদা যেমন বাড়ির সবাইকে চিঠি লিখত সুতপাকেও তেমনি প্রথম প্রথম বেশ ঘন ঘনই চিঠি দিত ।

ক্বচিৎ কখনো কৌতূহলী হয়ে সুমি বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করত, 'দাদা এত কী লেখেরে তোর কাছে ।' সুতপা বলত, 'ইংল্যাণ্ডের প্রাকৃতিক বর্ণনা—'

সুমি হেসে বলত, 'শুধুই প্রকৃতি বর্ণনা ?'

'দেখবি ? ইচ্ছা করলে দেখতে পারিস ।'

সুতপা জানে সুমি মরে গেলেও ওকে লেখা দাদার চিঠি দেখবে না । তাই এই সাহস দেখাত ।

সুমি চিঠি দেখত না । কিন্তু বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে চিঠি পাওয়ার সুখটুকু দেখে নিত । সুন্দর মুখে সুখের প্রসাধনটুকু দেখত । তখন তার মনে হত যে ভালোবেসেছে তার চেয়ে কেউ সুখী নয় এ সংসারে । সুমির মনে হত ওরা পরস্পরের মধ্যে এমন কিছু দেখেছে যা সুমি কখনো দেখেনি । এমন কিছু পেয়েছে সুমি যা পাওয়ার কথা ভাবতেই পারে না । কখনো কখনো যে হিংসে না হত তা নয় । শুধু চিঠিই তো নয় দাদা ওকে টেপ-রেকর্ডার কিনে দিয়েছে, ট্রানজিসটার রেডিও পাঠিয়েছে, জন্মদিনে ঘড়ি উপহার দিয়েছে । মাঝে মাঝে হিংসে হত । কিন্তু পাশাপাশি শুয়ে সুতপার মত অমন রূপ বিদ্যার গরবিনী মেয়েও সুমিকে যখন পরম সোহাগে জড়িয়ে ধরত সুমির তখন মনে হত সুতপার সুখ, সুতপার পাওয়া তারই পাওয়া, সুতপার সঙ্গে সে অভিন্ন হয়ে গেছে ।

দাদু এতক্ষণে বাথরুম থেকে বেরোলেন । একটু হেসে বললেন, 'তোকে অনেকক্ষণ একা একা বসিয়ে রেখেছি সুমি ।'

সুমি বলল, 'বাব্বা, নাইতে আপনার এতক্ষণ লাগে! আপনি দেখছি মেয়েদেরও বাড়া।'

দাদু বললেন, 'তুইতো আমার নাম দিয়েছিস অর্ধনারীশ্বর। ধরে নেনা আমি যাকে ভালোবাসতাম সে আমার অঙ্গের সঙ্গে মিশে আছে। আমি যখন নাইতে যাই বেরিয়ে এসে সেও নেয়ে নেয়।'

সুমি বলল, 'ভারি অভদ্র মেয়েতো। আর আপনি যখন খেতে বসেন তখনো কি সে সঙ্গে সঙ্গে খেতে বসে?'

দাদু হেসে বললেন, 'না তখন আমি একাই গ্রোগ্রাসে গিলে নিই। মেয়েদের নাওয়ার মধ্যে কবিত্ব আছে। মেয়েদের খাওয়ার বর্ণনায় কোন কবি সাহিত্যিককে মেতে উঠতে দেখেছিস?'

সুমি বলল, 'নাই বা মেতে উঠলেন। তাই বলে কি মেয়েরা খাবে না?'

দাদু হেসে বললেন, 'খাবেনা কেন, পুরুষদের চোখের আড়ালে খাবে। তাতে চুরি করে বেশি খাওয়ার সুবিধেটাও পাবে। সেটুকু পুরুষরা সহ্য করতে রাজি। কিন্তু মেয়েদের inartistic স্থূল অঙ্গভঙ্গি পুরুষের চোখে অসহ্য, অসহ্য।'

সুমি বলল, 'আপনি কোন কালের পুরুষের চোখের কথা বলছেন দাদু? এ কালের ছেলেদের দৃষ্টি অন্যরকম। তারা মেয়েদের সব কাজ কর্মের মধ্যেই রূপ দেখে। আপনাদের আমলের এক চোখোমি চলে গেছে।'

'কার সঙ্গে গল্প করছ দাদু?'

ভেজানো দরজা ঠেলে সুতপা ঘরে ঢুকল। তারপর সুমিকে দেখে বলল, 'ওমা তুই! তুই কখন এলি!'

সুমি বলল, 'অনেকক্ষণ। তোকেতো আর পেলাম না। দাদুর সঙ্গে বসে বসে ঝগড়া করছি।'

সুতপা বলল, 'বারে। পৃথিবীতে একমাত্র দাদুর সঙ্গে ঝগড়া করে যা সুখ আছে। আয় ভিতরে আয়।'

সুমি ওর সঙ্গে সঙ্গে গেল। পাশের ঘরখানি তালাবন্ধ। ওঘরে সাধনা মাসী থাকেন। সংসারের দামি জিনিসপত্রও সব ওঘরে।

সুতপার পড়াশুনোর দিকে যেমন ঝোঁক ঘরদোর গুছিয়ে রাখার দিকে তেমন নয়। ইচ্ছা করে যে উদাসীন থাকে কি এসব

কাজকে অবজ্ঞা করে তা সুমির মনে হয় না। আসলে নিজের কাজে ও এমন ভাবে থাকে যে এসব ব্যাপারে খেয়ালই থাকে না।

সিঙ্গল বেডের খাট আছে একখানা, জানালার ধারে পড়াশুনোর টেবিল। কয়েকটি র‍্যাকে স্তূপীকৃত বইয়ের রাশ। ছোট একটি ড্রেসিং টেবিলও আছে। দেয়ালে একটি মাত্র ক্যালেণ্ডার। কারো কোন ফটোটটো নেই। ফটো টাঙিয়ে রাখা সুতপা পছন্দ করে না।

সুমি লক্ষ্য করে দেখল দাদার দেওয়া উপহারগুলি আছে। রেডিও সেটটা আছে, দাদার দেওয়া ঘড়িটাও হাতে বাঁধা।

সুমি বলল, 'ঘরদোরের কি ছিরিই না করে রেখেছিস তুই, এখন কোন আমলে আছিস বলতো? মোগল আমলে না পাঠান আমলে?'

সুতপাও হেসে বলল, 'অতদূরে যাব কেন আমি বৃটিশ আমলের শেষ দশ বছরের মধ্যেই ঘুরে বেড়াচ্ছি। কিন্তু তুই যে আজ ভরদুপুরে হঠাৎ এখানে? তোর স্কুল টিস্কুল নেই?'

'ছিল। পালিয়ে এসেছি।'

'খুব ফাঁকিবাজ মেয়ে!'

সুমি বলল, 'সুতপা তোর সঙ্গে আজ অনেক কথা আছে।'

সুতপা তার দিকে একবার তাকাল, কী অনুমান করল কে জানে। একটু বাদে বলল, 'কথাটথা পরে হবে। দাদু না খেয়ে বসে আছেন। চল আগে খেয়ে নিই।'

স্নানটা আগেই সেরে গিয়েছিল সুতপা। মার ঘর খুলে নিয়ে সেখানে গিয়ে আটপৌরে শাড়ি পরল। বাথরুম থেকে মুখটুক ধুয়ে এসে সুমিকে বলল, 'চল, খেয়ে নিই এবার।'

সুমি বলল, 'সে কি রে। আমি তো খেয়েই বেরিয়েছি। আমি আবার কী খাব।'

সুতপা বলল, 'চল বসবি আমাদের সঙ্গে। দাদুর সঙ্গে গল্প করবি।'

ডাইনিং রুম বলে কিছু নেই। ডাইনিংস্পেস আছে রান্নাঘরের লাগা। সেখানেই টেবিল পেতে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা।

ভাত, ডাল, তরকারি সব এনে টেবিলের ওপর রাখল সুতপা। সুমি ওকে সাহায্য করল।

দাদু এসে বসলেন ওদের মুখোমুখি।

সুমি বলল, 'দাদু আজ আপনার কষ্ট হবে।'

'কেন বলতো।'

সুমি বলল, 'মেয়েদের খাওয়ার মত স্থূল ব্যাপার আপনাকে চোখে দেখতে হবে।'

দাদু বললেন, 'তোরা আবার মেয়ে নাকি ?'

'ও মা, আমরা তবে কী ?'

দাদু বললেন, 'ছায়া মায়া প্রহেলিকা ইত্যাদি ইত্যাদি।'

'রক্ত মাংসের কোন মেয়েকে আপনি দেখেন নি ?'

'কেবল একজনকেই দেখেছি।'

'কে তিনি ?'

দাদু বললেন, 'কী হবে সেই নাম শুনিয়ে ? বড্ড সেকেলে নাম। একজনের কাছে যে নাম ইষ্টমন্ত্র আর পাঁচজনের কানে তা কড়কড় করবে। কী দরকার ?'

সুমি বলল, 'যাঁকে পেলে নয় তার নাম জপ করে তাঁর মূর্তি ধ্যান করে সারা জীবন কাটিয়ে দিলেন ? তাই কি দেওয়া যায় ? এ কথা আপনি আমাদের বিশ্বাস করতে বলেন ?'

দাদু এবার একটু সিরিয়াস হয়ে গেলেন। গম্ভীর ভাবে বললেন, 'বিশ্বাস করা না করাটা তোদের মর্জির ওপর নির্ভর করে। আমি বললেই কি তোরা আর বিশ্বাস করতে পারবি ?'

সুতপা এবার একটু ধমকের স্বরে বলল, 'কী বাজে তর্ক করছিস সুমি ? নিজেও খাচ্ছিসনে, দাদুকেও খেতে দিচ্ছিসনে।'

সুমি এবার লজ্জিত হয়ে পরিবেশনের ভার নিল। কিন্তু শুধু দিয়ে থুয়েই নিস্তার পেল না। দাদু আর সুতপার অনুরোধে কিছু খেতেও হল।

খাওয়া দাওয়ার পর দাদু বসবার ঘরে গিয়ে চুরুট ধরালেন, হেসে বললেন, 'এর গন্ধটা আবার আমার তপুদিদির সহ্য হয় না। কী করি বহুদিনের অভ্যাস, ছাড়তেও পারিনে।'

সুতপা হেসে বলল, 'আমার জন্যে কেন তুমি নেশার জিনিস ছাড়বে ? আমি তো আর তোমার সেই বিবি নই।'

দাদুকে বিশ্রাম করতে দিয়ে সুতপা সুমিকে নিয়ে নিজের ঘরে এল। বলল, 'বাসের জন্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ব্যাথা হয়ে গেছে।

রোদ লেগে মাথা ধরেছে। একটু শুয়ে নিই। শুবি তুই?'

সুমি বলল, 'আপত্তি কি। স্কুল যখন কামাইই করলাম, হয় ঘুমোব না হয় সিনেমা দেখব। সুতপা দেখবি কোন সিনেমা টিনেমা? যাবি ম্যাটিনি শোতে?'

সুতপা বলল, 'না ভাই। এইতো ঘোরাঘুরি করে এলাম। ভালো লাগছে না। তার চেয়ে একটু শুয়ে থাক, সেই ভালো।'

একজনের বিছানায় দুজনে ঘেঁষাঘেঁষি করে শুয়ে পড়ল। সুমি এসে আরো অনেকবার শুয়েছে। কে জানে এই হয়তো শেষ শোয়া। দাদা যা কাণ্ড করে বসল তাতে এর পরেও কি সুমির সঙ্গে সুতপা বন্ধুত্ব রাখবে? ভদ্র শিক্ষিত রুচি সম্পন্ন পরিবারের মেয়ে। সঙ্গে সঙ্গেই যে মুখ দেখাদেখি বন্ধ করে দেবে তা নয়। তবে আস্তে আস্তে সমস্ত উত্তাপ পুড়িয়ে জুড়িয়ে যাবে। ঘনিষ্ট বন্ধুত্ব সাধারণ আলাপ পরিচয়ের সম্পর্কে নেমে আসবে। বড় খারাপ লাগবে সুমির। তেমন সম্পর্ক থাকার চেয়ে না থাকাই ভালো।

একটু চুপ করে থেকে সুমি বলল, 'আচ্ছা সুতপা, ভালোবাসার ঘনিষ্টতায় তোর বিশ্বাস আছে?'

সুতপা একটু যেন চমকে উঠল, বলল, 'হঠাৎ ও কথা বলছিস যে?' সুমি বলল, 'আমি দাদুর কথা ভাবছিলাম।'

আসলে সে ভাবছিল দাদার কথা। কিন্তু তাতো চটকরে ওকে বলা যায় না।

সুতপা কোন কথা বলল না।

সুমি ওর কাঁধ ধরে একটু নাড়া দিয়ে বলল, 'বল না।'

সুতপা তবু কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।

দরজা ওরা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়েছে। জানালায় জানালায় পুরু পর্দা। দিন দুপুর যেন অন্ধকার রাত দুপুরের মত।

'বল্ না।' সুমি আবার তাগিদ দিল।

সুতপা বলল, 'কী হবে ওসব নিয়ে আলোচনা করে? তোর তো ওনিয়ে কোন মাথা ব্যাথা নেই।'

সুমি বলল, 'নিজের মাথা-ব্যাথাটাই কি সব?' দাদুর সঙ্গে যতই তর্ক করিনে কেন একজনকে ভালোবেসে থাকতে পারাটাই

কিন্তু ভালো। একজনের মধ্যে যারা সব পায় তারাই ভাগ্যবান। আর যারা দ্বারে দ্বারে ঘোরে তারা হতভাগা। তারাও হয়তো একই বস্তুই খোঁজে, অনেকের মধ্যে সেই একজনকেই খোঁজে। কিন্তু মুখে সে কথা স্বীকার করে না। নিজেরাও সে কথা বুঝতে পারে না। তাদের মত হতভাগ্য আর নেই।'

সুতপা চুপ করে রইল।

কিন্তু সুমি যেন মনের সব কথা ঢেলে দেওয়ার জন্যে এসেছে।

'তুই দাদার চিঠি পেয়েছিস?'

সুমির ইচ্ছা ছিল না আজই একথা বলে। কিন্তু ভিতর থেকে কে যেন তাকে ঠেলে নিয়ে চলেছে। তাকে যেন স্থির থাকতে দিচ্ছে না। এই আঘাত এই বেদনা এই অপমান এই বিশ্বাস হননের যন্ত্রণা যেন সুমিরই, আর কারো নয়।

'পেয়েছিস চিঠি?'

সুতপা মৃদু স্বরে বলল, 'পেয়েছি।'

'কী লিখেছে দাদা?'

সুজাতা একটু চুপ করে বলল সবই লিখেছে। তুই যা বলতে এসেছিস সুমি আমি তা জানি। সে আগেই সব জানিয়েছে।'

সুজাতা আর কিছু বলল না।

সুমি এরপর কী যে বলবে ভেবে পেল না। অথচ বলবার জন্যে তার আগ্রহের শেষ নেই। সে বন্ধুকে আশ্বাস দিতে চায় সান্ত্বনা দিতে চায়, দাদার জন্যে ক্ষমা ভিক্ষা করতে চায়। কিন্তু সুতপা যেন ওসব কিছু চায় না। পৃথিবীতে তার আর কিছু দরকার নেই।

সুতপা এবার পাশ ফিরল। বলল, 'বড্ড মাথা ধরেছে। এবার একটু ঘুমুবো। একটা ট্যাবলেট খেলাম। তবু কমছে না। ঘুমুতে পারলে তবে শান্তি।'

সুমি বলল, 'আমি কি তোর মাথাটা একটু টিপে দেব?'

সুতপা বলল, 'না না। তাতে আমার ভারি অস্বস্তি লাগে। তুই বরং আমাকে একটু ঘুমুতে দে। তোর যদি ঘুম না পায় দাদুর সঙ্গে বসে খানিকক্ষণ গল্প কর গিয়ে। পরে আমরা একসঙ্গে বসে চা-টা খাব।'

সুমি বুঝতে পারল এই মুহূর্তে সুতপা সম্পূর্ণ একা থাকতে

চাইছে। যে পরম অন্তরঙ্গ ছিল সেই যখন দূরে সরে গেল বাইরের কারো সঙ্গই এই মুহূর্তে তার কাছে আর সহনীয় নয়।

সুমি চুপ করে রইল। অথচ অনেক কথা তার জানবার ইচ্ছা ছিল। কেন এমন হল, ভিতরের ইতিহাসটা কী, সুতপা আগে থেকেই কিছু টের পেয়েছিল কিনা সুমির জানবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আর কিছুই জানা যাবে না। সুতপা পাষাণ হয়ে গেছে। ওর মুখ থেকে কিছুই আজ আর বের করা যাবে না। ওকে কিছু বলতে যাওয়াও এখন অর্থহীন।

সুতপা কি সত্যিই ঘুমুচ্ছে না ঘুমের ভান করে পড়ে আছে, সুতপা কি মাথা ধরার ওষুধ খেয়েছে না ঘুমের ওষুধ খেয়েছে কে জানে?

সুমি উঠে পড়ল। আজ আর এখানে থেকে লাভ নেই। আর একদিন আসতে হবে। শোকের প্রথম তীব্রতাটা কেটে যাক। তখন হয়তো সুমিকে সুতপার ফের দরকার হবে।

বাইরের ঘরে সুমি এসে দেখল দাদু একখানা মোটা বই পড়ছেন।

'কী পড়ছেন দাদু?'

দাদু মুখ তুলে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, 'এটা মেটা ফিজিক্স।'

সুমি ভাবল ওই বয়সে এসব ছাড়া আর কি পড়বেন। চুরুটের গন্ধের সঙ্গে অধ্যাত্মবিদ্যার ধোঁয়া। কিন্তু সব সান্ত্বনা কি আছে ওই বিদ্যায়? জীবনের সব আশ্বাস সব আশ্রয় কি ওর মধ্যে পাওয়া যায়?

সুমি বলল, 'চলি দাদু।'

'সেকি এই রোদের মধ্যে কোথায় যাবি? সুতপা কী করছে।'

'ও ঘুমুচ্ছে। আমার ঘুম পেল না। আমি যাই। একটু কাজ আছে। ওকে বলবেন।'

দাদু বললেন, 'আচ্ছা।'

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সুমি ভাবল কাজ না ছাই। আজ তার কোন কাজ নেই। সঙ্গী নেই, বন্ধু নেই।

পালাবার একটা জায়গা পর্যন্ত নেই। হাত ঘড়িটা দেখে নিল

সুমি। ম্যাটিনি শোয়ের এখনো সময় আছে। এই পাড়ার সিনেমা হাউসে যে হিন্দী ছবিটা হচ্ছে সেখানে যাওয়াই ভালো। তাতে প্রেম-ট্রেম, নাচ-গান খুন জখম সব আছে।

কিন্তু যা ভিড় হচ্ছে তাতে এই শেষ মুহূর্তে গিয়ে এখন টিকিট পাওয়া গেলে হয়।

৪

সুতপা ঘুমোয়নি। ঘুমের ভান করে পড়েছিল। কখন সুমি উঠে গেল দাদুর সঙ্গে কথা-বার্তা বলে চলে গেল সবই সুতপা জানে। বেচারা সুমি। ওর জন্যে কষ্ট হয় সুতপার। ও এসেছিল সান্ত্বনা দিতে, দুটো সমবেদনার কথা জানাতে। ওর সঙ্গে এমন রূঢ় ব্যবহার না করলেই হত। সত্যি সুমি তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। অকৃত্রিম বন্ধু। কোন ছেলে যখন সুতপার সঙ্গে আলাপ পরিচয় ঘনিষ্ঠতার আগ্রহ দেখায় বুঝতে অসুবিধা হয় না সে কোন আকর্ষণে এসেছে কিন্তু কোন মেয়ে যখন আর একটি মেয়ের সত্যি-কারের বন্ধু হয় সে বন্ধুত্বের স্বাদ আলাদা। তার কাছে কোন সাজসজ্জার দরকার হয়না, ছলা কলা আড়াল আবডালের দরকার হয়না। সুমি তার সত্যিই অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাকে ভালোবাসে। স্কুল কলেজের যারা বন্ধু ছিল তাদের প্রায় কারো সঙ্গেই এখন আর সুতপার বন্ধুত্ব নেই। বিয়ে হওয়ার পর কেউ কেউ কলকাতার বাইরে চলে গেছে। প্রথম প্রথম দু'একখানা চিঠিপত্র লেখালেখি চলত। তারপর সব বন্ধ। কলকাতায় যারা আছে তাদের সঙ্গেও কচিৎ কখনো দেখা সাক্ষাৎ হয়। যাদের বিয়ে হয়েছে তারা নিজেদের ঘর-সংসার নিয়ে ব্যস্ত। যাদের বিয়ে হয়নি তারা শুধু বিয়ের জন্যেই উৎসুক। বিয়ে যদি নাও হয় অন্তত একটা ভালো চাকরি চাই। সবাই সরে গেছে। বন্ধু হিসাবে শুধু সুমিই আছে কাছা-কাছি। সুমির মনেও কত নৈরাশ্য। বিয়ে হচ্ছে না, কোন ছেলের সঙ্গে আজ পর্যন্ত ওর কোন বন্ধুত্ব গড়ে উঠল না। ভালো চাকরিই বা ওর একটা হল কই।

ওর নৈরাশ্য আছে। কিন্তু সেই নৈরাশ্যে ও সব সময় হা-হুতাশ

করে না। বরং সুতপার গৌরবেই ওর যেন গৌরব, সুতপার সুখই যেন ওর সুখ। এই একাত্মতা অনেক সময় ভালো লাগে। আবার কোন কোন সময় দুঃসহ মনে হয়।

আজ সুমিকে দেখে ভিতরে ভিতরে চটে গিয়েছিল সুতপা। কেন এল ? ও আজই কেন এল ? কটা দিন সবুর করতে পারল না সুমি ? কে ওকে ডেকেছে সমবেদনা জানাবার জন্যে ? এই সহানুভূতি ষোল আনা অকৃত্রিম হতে পারে ? দিলীপ যদি ওর দাদা না হত তাহলেও কথা ছিল। কিন্তু দিলীপ একই সঙ্গে ওর দাদা আর বন্ধু। দাদাকে ও যে কত ভালোবাসে তাতো সুতপা জানে। সুতপা একদিন ওকে ঠাট্টা করে বলেছিল, 'নিতান্তই তোর আপন দাদা। তাই আমার সঙ্গে ওকে বন্ধুত্বের সুযোগ দিয়েছিস। কাজিন টাজিন হলে বোধহয় আর কারো কাছে ঘেঁষতে দিতি না।'

সুমি বলেছিল, 'তুই বড় অভদ্র হয়েছিস সুতপা। দাদা আমার বন্ধু। কিন্তু সব বন্ধুত্ব কি সমান ?'

তা ঠিক। সব বন্ধুত্ব সমান নয়। তাই দিলীপ যত অপরাধই করুক সুমি তাকে ফেলে দিতে পারবে না। কিন্তু এই ঘটনার পর দিলীপকে মনের কোন কোণেই সুতপা কি স্থান দিতে পারবে ?

শেষ পর্যন্ত দিলীপই কিন্তু হেরে গেল। নৈতিক পরাজয়। প্রতিশ্রুতি রাখতে না পারার অক্ষমতা তাকে স্বীকার করতেই হল।

একবার কথা হয়েছিল ইংল্যাণ্ডে যাওয়ার আগে দিলীপ বিয়ে করে যাবে। কিন্তু সুতপাই তাতে রাজি হয়নি।

'তুমি বরং তোমার পড়াশুনো সেরে এসো। কাজকর্ম মিটিয়ে নাও তারপর বিয়ে !'

তখন তো কথা ছিল ডক্টরেট করবার জন্যেই বাইরে যাচ্ছে দিলীপ, শুধু অর্থ উপার্জন তার উদ্দেশ্য নয়।

সুতপা বলেছিল, 'বিয়ে করে বাইরে যাওয়া মানে যেন রক্ষাকবচ হাতে বেঁধে বিদেশে যাওয়া। বরং পরীক্ষা হোক দু বছর বাইরে থেকেও তুমি আমাকে ভালোবাসতে পার কিনা। আমাদের ভালোবাসা কতখানি টেঁকসই তার একটা যাচাই হয়ে যাক।'

কেন একথা বলেছিল সুতপা সে এখন নিজেই ভেবে অবাক হয়ে

যায়। সে যে দুর্বল নয়, দিলীপের মত ছেলেকেও সে যে হারাবার ঝুঁকি নিতে পারে এই অহঙ্কারটাই কি তার মনে প্রবল হয়ে উঠেছিল? না আরো একটা অপ্রীতিকর ছবি তার মনে ভেসে উঠেছিল। বিয়ে করে একজন তার ওপর দখলিস্বত্ব জারি করে গেছে। আর সে শাঁখা সিঁদুরে সেই চিহ্ন বয়ে বেড়াচ্ছে। সুতপার ছেলে বন্ধুরা তা দেখে হেসে বলছে, 'তুমি এখন অন্যের সম্পত্তি।'

দৃশ্যটা কল্পনা করে সুতপার ভলো লাগে নি।

দিলীপ একটু হেসে বলেছিল, 'বুঝতে পেরেছি। তুমি তোমার নিজের পথটা খোলা রাখতে চাও। এই দু' বছরে যদি কোন বেটার চানস আসে সেই সম্ভাবনাকে নষ্ট করে লাভ কি? এই তো তোমার মনের কথা?'

সুতপা বলেছিল, 'আমার মন দেখছি তোমার কাছে সহজ পাঠের মত সোজা। একটি মেয়ের জীবনে আমাদের দেশে কটা চানসই বা আসে। তার চেয়ে তোমার চানস তো অনেক বেশি। তবু তে আমি ঝুঁকি নিচ্ছি। নিজের ওপর বিশ্বাস আছে বলেই তো নিতে পারছি।'

দিলীপ জবাব দিয়েছিল, 'কেবল নিজের ওপর বিশ্বাসের কথাটাই বললে। আমার ওপরও যে বিশ্বাস আছে এ কথা তো কই একবারও বললে না।'

সুতপা কৌতুক করে বলেছিল, 'তুমি যে বিশ্বাসের পাত্র তার প্রমাণ আগে পাই।'

কিন্তু মাঝে মাঝে কী যে হত দিলীপের, ঠাট্টা তামাসা বুঝতে পারত না।

গম্ভীরভাবে বলেছিল, 'ঠিক আছে। মানে তুমি এখনো নিজের মন বুঝতে পারছ না। তোমার আরো সময় চাই, বেশ নাও সময়।'

সুতপা কিন্তু সত্যি সত্যি সময় চায় নি। শুধু এইটুকু চেয়েছিল বিয়ের পর যেন তাদের আলাদা থাকতে না হয়। কিন্তু দিলীপেরও কি জেদ কম! কিন্তু বিয়ে করেই সুতপাকে সে সঙ্গে নিয়ে যাবে, কি দু চার দু' মাসের মধ্যে নেবে, এমন প্রতিশ্রুতি সে দেয়নি।

বলেছে, 'আমি কথা দিতে পারিনে। যখন আমার সময় সুযোগ হবে তখন তোমাকে নেব।'

সুতপা বলেছে, 'তোমার সময়টাই বুঝি শুধু সময়? আমার সময়টা আর সময় নয়? বেশ তোমার টাকায় আমি ইংল্যাণ্ডে যাবই না, তোমার পরিচয়ে আমি যাবই না। আমি নিজের টাকায় নিজের পরিচয়ে ওখানে যাব। বিয়ে যদি হয় কলকাতায় না লণ্ডনেই হবে।' আশ্চর্য, কেন এসব কথা বলতে গিয়েছিল সুতপা পরে নিজেই ভেবে অবাক হয়ে গিয়েছিল।

এর আগেও তাদের মিলনের মুহূর্তগুলি অবিমিশ্র ছিলনা। সুমি তাদের মেলামেশার কত সুযোগ করে দিত। কিন্তু সব সুযোগের সদ্ব্যবহার সুতপা করতে পারেনি। তর্ক হয়েছে কথা কাটাকাটি হয়েছে। দিলীপ যতদিন কলকাতায় ছিল ততদিন তো আর কোন মেয়ে তাদের মধ্যে আসেনি। কিন্তু আরো একটি মেয়ে যেন ছায়ার মত তার পিছনে পিছনে গেছে। সুবিধা পেলেই মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে। কত চোখা চোখা কথা, কড়া কড়া কথা দিলীপকে বলেছে। দিলীপ যা পছন্দ করে না তাই যেন বেশি করে ওকে শুনিয়েছে। তার অপছন্দমত ব্যবহার করেছে। সুতপা কল্পনা করে সেই মেয়েটির সঙ্গে তার শুধু আকৃতিগত মিল আছে আর কোন মিল নেই। দিলীপ তুমি ভুল করলে। আমাদের দুজনের মধ্যে কোনটি আসল কোনটি নকল চিনে নিতে পারলে না।

দিলীপ ইংল্যাণ্ডে যাওয়ার আগে কিন্তু সুতপার মত বদলে গিয়েছিল। ওকে চুপি চুপি বলেছিল, 'শোন বিয়েটা হয়েই যাক।'

দিলীপ হেসে বলেছিল, 'ক্ষেপেছ? আমার যাওয়ার আর এক সপ্তাহও বাকি নেই। আমি হোল্ড অল বেঁধে ফেলেছি।'

সুতপা বলেছিল, 'হোল্ড অল খুলতে কতক্ষণ। শুনেছি টাকা খরচ করলে কি জানা শোনা থাকলে চব্বিশ ঘণ্টার নোটিশেও রেজেষ্ট্রি ম্যারেজ হয়। সেই ব্যবস্থাই কর না। টাকা আমার কাছে আছে।'

দিলীপ বলেছিল, 'প্যাসেজমানির জন্যে জমিয়ে রাখো। অত তাড়াহুড়ো করার দরকার কি। বিয়েটা লণ্ডনে গিয়েই হবে।'

তারপর অবশ্য দিলীপ ওর হাতখানা ধরে নিজের হাতের মধ্যে কিছুক্ষণ রেখে একটু চাপ দিয়ে বলেছিল, 'এত ভাবছ কেন? ভয় নেই।'

সুতপা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়েছিল, 'ভাবব কেন। ভয়ই বা কেন করতে যাব? তুমি আমাকে কী ভাবো বলতো।'

দিলীপ তুমি সেই দর্পিতা অহংকারিণীকেই দেখলে। তার আড়ালে আরো একজন যে ছিল তাকে তুমি চিনতেই পারলে না। এই তোমার পৌরুষ? তুমি তোমার কথার মর্যাদা রাখতে পারলে না। এই তোমার পুরুষত্বের বড়াই?

এই পৌরুষ নিয়ে আরো কয়েকবার কথা হয়েছে দিলীপের সঙ্গে।

'সেকালই বল, একালেই বল, সবকালের পুরুষই মেয়ের মধ্যে একটি মেয়েকেই চায়। **Just a woman, a womanly woman.**'

সুতপা জবাব দিয়েছিল, 'শুধু চাইলেই কি হয়? পুরুষের মত পুরুষই সেই মেয়েকে চায়। আর কারো তাতে অধিকার নেই।'

দিলীপ, প্রমাণ হয়ে গেল তুমি যথেষ্ট রকমে পুরুষও নও। তুমি বিলাতেই যাও আর হাজার হাজার টাকা রোজগারই কর আর বহু মেয়েকে ভোগই কর আমি তাকে পৌরুষ বলিনে। আমার কাছে পৌরুষের সংজ্ঞা আলাদা। আমার কাছে পুরুষের মূর্তি আরো মহিমা দিয়ে গড়া।

দরজায় টোকা পড়ল।

'কে?'

'কি রে আর কতক্ষণ ঘুমোবি। চারটে যে বেজে গেল। চা টা কিছু পাব?'

দাদুর গলা।

সুতপা সাড়া দিয়ে বলল, 'উঠছি দাদু।'

তারপর দোর খুলে বাইরে এসে একটু হেসে বলল, 'চা চা করে খুব যে চ্যাঁচাচ্ছো। চা যদি ভাগ্যে থাকে তা হলে পাবে। নইলে পাবে না।'

দাদু বললেন, 'আমার ভাগ্য তো সব তোদের হাতে। লোকে বলে স্ত্রী ভাগ্যে ধন। আমার তো সেই স্ত্রীও হল না, ধন জন ও হল না। নাতনী ভাগ্যে এক কাপ চাও যদি না জোটে—'

'দেখা যাক তোমার ভাগ্য আর আমার হাত যশ।'

দু' কাপ চা করে নিয়ে দাদুর সামনে বসল সুতপা। বালকই হোক, বৃদ্ধই হোক যে কোন একজনের সঙ্গ পেলেই হয়। একা একা সুতপা আর থাকতে পারছে না। তা ছাড়া একা থাকতে চাইলেই কি থাকবার যো আছে! একা থাকলেই আর একজন বিশ্বাস-ঘাতী পুরুষ সামনে এসে দাঁড়ায়। সুতপাকে মনে করিয়ে দেয় সে কত অসহায়। কোন প্রতিকার প্রতিশোধের সাধ্য নেই। অত দূরে যে রয়েছে তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু কাছে থাকলেই কি তেমন কিছু করতে পারত? সুতপার আত্মমর্যাদায় বাধত না?

'বাঃ চমৎকার চা হয়েছে। কিন্তু তখন থেকে গোবিন্দের মা হয়ে বসে আছিস কেন বলতো? অমন সুন্দর মুখখানাকে একেবারে হাঁড়ি বানিয়ে রেখেছিস।'

'তাই নাকি? খুব সুন্দর মুখ নাকি?'

দাদু বললেন, 'ওগো সুন্দরী, সে কথা তুমি নিজেও জানো। তবু শুনতে চাওয়ার বিরাম নেই। হাঘরে ভোমরা যদি কানের কাছে গুন গুন করে তাতেও তৃপ্তি হয় না।'

দাদুর বলার ভঙ্গিতে সুতপা একটু হেসে বলল, 'সত্যিই আমাকে তোমার সুন্দর লাগছে? তুমি যাকে ভালোবাসতে তার চেয়েও সুন্দর?'

দাদু বললেন, 'আহা আবার তুলনা টানা কেন। তোমরা সবাই অতুলনীয়া।'

সুতপা বলল, 'বুঝতে পেরেছি। তুমি আসল কথাটা বলতে চাও না। তাই ওই সব মন ভোলানো কথা। এবার বল যিনি আমার দিদিমা হব হব করছিলেন তিনি শেষ পর্যন্ত কেন হলেন না? তুমি তাকে রিফিউজ করলে না তিনিই তোমাকে রিজেক্ট করে দিলেন?'

দাদু করুণ মুখে বললেন, 'আর বলিস কেন তিনিই আমাকে যোগ্য মনে করলেন না। তিনি নয় তার বাপ। আমি যে তাঁর মেয়েকে খাইয়ে পরিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে রাখতে পারব তিনি তেমন ভরসা পেলেন না!'

'বেশ করেছেন উপযুক্ত কাজ করেছেন। তাঁর নিশ্চয়ই বিয়ে থা হয়ে গেছে।'

দাদু বললেন, 'ক-বে।'

'তবু এখনো তুমি সেই পরস্ত্রীর ধ্যান কর ?'

'করি বই কি। তবে তিনি এখন আর শুধু স্ত্রী নন। জননী গৃহিনী। তাছাড়া ডজন খানেক নাতি নাতিনীর ঠাকুরমা দিদিমা। এখন শুধু ধ্যান করা নয় দেখা করতেও বাধা নেই।'

'তুমি যাও দেখা করতে ?'

'মাঝে মাঝে যাই বইকি।'

'প্রেমালাপটা কেমন হয় ?'

দাদু হেসে বললেন, 'কেমন আর হবে ? আমি বলি ওগো কেমন আছ ? তিনি বলেন যেমন দেখছ।'

সুতপা ভাবল কোনদিন দিলীপ আর তার মধ্যে কি ওই ধরণের সম্পর্ক হবে ? অতিরিক্ত বুড়ো হয়ে যাওয়ার পর সুতপার মনেও কি অমন প্রশান্তি আসবে, ক্ষমা আর ঔদার্য আসবে ? তখন কি হবে কে জানে এখন তো সে কথা ভাবতে পারছে না সুতপা। এখন শুধু ভাবছে একটা শোধ নিতে পারলে হত। সেই প্রতিশোধের চেহারা কেমন হবে তা তার ধারণায় নেই। দিলীপের বোন সুমিকে অপমান করলে কি গায়ের জ্বালা মিটবে। নাকি ওর বাবা প্রফুল্ল-বাবুর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলে এর সমুচিত জবাব হবে ? না কি বসে বসে ফ্লার্ট করে তাঁকে হতবাক করে দেবে ? আর তো তাঁর শ্বশুর হওয়ার সম্ভাবনা নেই, তাতে দোষ কি। নিজের উদ্ভট কল্পনায় নিজেই হাসল সুতপা।

বেলা পড়ে এসেছে। ফ্লাট বাড়িগুলির পাশ দিয়ে যে রাস্তাটুকু গেছে তা এতক্ষণ প্রায় জনবিরল ছিল। এখন রিকসা চলছে ট্যাকসি চলছে। লোকজনের চলাচলও বেড়েছে।

দাদু উঠে চলে গেলেন বৈকালিক ভ্রমণে। সকাল সন্ধ্যায় তাঁর কয়েক মাইল করে হাঁটা চাই। এতে নাকি শরীর মজবুত থাকে। এই বয়সে মজবুত শরীর দিয়ে তিনি কী করবেন তিনিই জানেন।

একটু বাদে সাধনা অফিস থেকে ফিরলেন। আজ তাড়াতাড়িই ফিরেছেন। মুখখানা গম্ভীর।

একটু ক্লান্ত একটু যেন অবসন্ন লাগছে মাকে। মায়ের জন্যে মাঝে মাঝে দুঃখ হয় সুতপার। মার একমাত্র আশা ভরসা সে।

শত পুত্র সম কন্যা। অনেক যত্ন করে মানুষ করেছেন। যে বয়সে বিধবা হয়েছিলেন আর তাঁর যা রূপ গুণ তাতে স্বচ্ছন্দে আর একবার বিয়ে করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। সুতপা ভাবল করলে বোধহয় ভালোই হত। তাঁর আর একটা সংসার হত, স্বামী হত, নানা রকম ডাইভারশন ছাড়াও সুতপাকে একটি বিধবা মহিলার সর্বস্ব হয়ে থাকতে হত না। মার সবই ভালো শুধু বেশি খবরদারি করেন। সুতপা যে বড় হয়েছে সে কথা মনে রাখতে পারেন না, মানতেও চাননা। কারণে অকারণে সুতপার ব্যক্তিগত জীবনে এসে ঢুঁ মারেন। মেয়ের সব কিছুই তাঁর নখদর্পণে রাখা চাই। কেন?

সাধনা বললেন, 'এই যে বাড়িতেই আছিস।'

'হ্যাঁ।'

'বেরোসনি ?'

'সকালে একবার বেরিয়েছিলাম।'

মা অফিসের শাড়িটারি বদলে মুখ হাত ধুয়ে নিজেই চা করলেন খাবার করলেন। গ্যাসের উনুন করে নিয়েছেন। তাতে সব তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। বাইরের কোন কাজের লোক রাখেন না মা। রাখবেন কি। তাদের কারো সঙ্গে বনিবনাও হয় না। তাদের হাতের কাজও তাঁর পছন্দ নয়। সুতপা তাকিয়ে তাকিয়ে মার কর্ম-তৎপরতা দেখল। তাঁকে সাহায্যের জন্যে এগিয়ে এল না। সুতপা জানে মার এখন যা মন মেজাজ তাতে তার কাজ ওঁর পছন্দ হবে না।

সাধনা আদেশের সুরে বললেন, 'আয় খাবি আয়।'

সুতপা বলল 'তুমি খেয়ে নাও মা। আমি দাদুর সঙ্গে একটু আগে চা খেয়েছি।'

'চায়ের সঙ্গে আর কী খেয়েছিস ?'

সুতপা বলল, 'আর আবার কী খাব ? সব সময় কি মানুষের খেতে ইচ্ছা করে ?'

সাধনা বললেন, 'ইচ্ছা না করলেও খেতে হয়। না খেয়ে খেয়ে শুকিয়ে শুকিয়ে থাকো একটা কিছু ঘটাও। তারপর তাই নিয়ে আবার হুলুস্থুল হোক। এসো বলছি।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও সুতপা গিয়ে টেবিলে বসল। না খেলে মা

নিজেই একটা হুলুস্থুল বাধাবেন। তার চেয়ে কিছু মুখে দেওয়া ভালো। খাওয়ার ভান করা যায়, না ঘুমিয়ে ঘুমোবার ভান করা যায়, না ভালোবেসে ভালোবাসার ভান করা কি যায় না? কে জানে বাকি জীবন হয়তো সুতপাকে এই ভান করেই কাটাতে হবে। সুতপার মনে হল সব ভালোবাসার মধ্যেই ভান আছে। খানিকটা ভালোবাসা খানিকটা ভান। এই যে খাবার নিয়ে মা তাকে এত সাধাসাধি করছেন এর মধ্যেও কি বাড়াবাড়ি নেই? এই মুহূর্তে মার মনে মাতৃস্নেহ যে উথলে পড়ছেনা তা সুতপা জানে। তবু তো দেখানো হচ্ছে, সুতপাকে দেখতেও হচ্ছে।

সাধনা বললেন, 'প্রফুল্লবাবু ফোন করেছিলেন।' সুতপা লুচি তরকারি খেয়ে যেতে লাগল। কোন কথা বলল না।

সাধনা খেতে খেতে বললেন, 'তিনি বললেন তিনি একটু বাদেই আসছেন।'

সুতপা অসহিষ্ণু হয়ে বলল, 'তিনি আসবেন কী করতে? তুমি বলে দিলে না কেন মা তাঁর আসবার কোন দরকার নেই?' সুমি এসেছিল। আমি তার সঙ্গে কথা বলিনি।'

সাধনা মেয়ের দিকে তাকালেন, 'এ তোর বাড়াবাড়ি। ব্যাপারটা হঠাৎ ঘটেনি, এমন যে হবে তুই তার আভাস ইঙ্গিত কি আগে থেকেই পাসনি?'

সুতপা বলল, 'মা তুমি নিশ্চয়ই আমার চিঠিপত্র চুরি করে পড়েছ। তুমি কেন প্রভিডেণ্ডফাণ্ডে পড়ে আছ। আই বি ডিপার্টমেণ্টে চলে যাও তাড়াতাড়ি উন্নতি করতে পারবে।'

সাধনা বললেন, 'দায় পড়েছে আমার চিঠি পড়তে। আগে তো দিলীপ আমার কাছেও চিঠি লিখত। ওখানকার টপোগ্রাফি, ওখানকার মেশিন লাইফ কত কি লিখে লিখে জানাত। তারপর সব বন্ধ হয়ে গেল। শুধু পরের ছেলের দোষ দিলে কি হবে সুতপা, তোরও দোষ আছে। ওর সঙ্গে কথা পাকাপাকি হবার পরেও তুই অনেক ছেলের সঙ্গে মিশেছিস। তাদের সঙ্গে আড্ডা দিয়েছিস, গল্প করেছিস সিনেমা দেখেছিস। সব আমার কানে এসেছে। তার কানেও যেতে পারে। তার তো এখানে বন্ধুবান্ধবের অভাব নেই।'

সুতপা বলল, 'তাদের তুমি বন্ধু বলো না মা, ইনফর্মার। মিশেছি তো কী হয়েছে? তুমি তোমার কলীগদের সঙ্গে মেশ না? তুমি প্রফুল্লবাবুর সঙ্গে মেশ না? মেলা-মেশা মানেই কি ভালোবাসা? নাকি ভালোবাসা মানেই বিয়ে করা?'

সাধনা এর জবাবে কিছু বললেন না। খাবার শেষ করে চায়ের কাপটা সামনে টেনে নিলেন।

একটু বাদে ফের শুরু করলেন, 'রীজার কথাতো দিলীপ তোকে আগেও লিখেছিল।

সুতপা বলল, 'হ্যাঁ লিখেছিল। একটি বাঙালী মেয়ের সঙ্গে ওর আলাপ হয়েছে। দিলীপের অসুখের সময় সে নাকি ওকে খুব সেবা শুশ্রূষা করেছে। নিজের কাজকর্মের ক্ষতি করে, কলেজ কামাই করে ওকে রেঁধে খাইয়েছে। সেই থেকে বন্ধুত্ব। মেয়েটা লেখা পড়া এমন কিছু জানেনা। কিন্তু তাতে কী এসে যায়? আমি তো জানতাম না মা ওর একজন নার্স দরকার, রাঁধুনী দরকার, ধোপানী দরকার, ওর স্ত্রীর কোন দরকার নাই।'

সাধনা বললেন, 'তুই সত্যিই কিছু জানিসনে সুতপা। দরকার হলে স্ত্রীকে নার্স হতে হয় রাঁধুনী হতে হয়। সব হয়েও স্ত্রী হওয়া যায়। সব হয়েই স্ত্রী হতে হয়। ভালোবাসা কোন ওয়াটার টাইট কম্পার্টমেন্টে বাস করে না।'

সুতপা ভাবল অক্ষমতাটা কার? সব হওয়ার তাগিদ যার মধ্যে জাগল না, দায়িত্বটা কি শুধু তার? না কি যে জাগাতে পারল না তারও?

দোরে কলিং বেলের শব্দ। দাদু না প্রফুল্লবাবু না কি আর কেউ?

মা যখন উঠলেন না সুতপাকেই উঠে দোর খুলে দিতে হল। যা আশঙ্কা করেছিল তাই। অবাঞ্ছিত অতিথি প্রফুল্লরঞ্জন। মুখখানা বিষণ্ণ করুণ। কিন্তু এই অনাত্মীয় এক প্রৌঢ় ভদ্রলোকের বিষণ্ণতায় সুতপার কী এসে যায়। তা ছাড়া এই দুঃখের কতখানি অকৃত্রিম তাতেও সন্দেহ আছে।

সুতপা বেশ একটু সময় নিয়ে বলল, 'আসুন।' আমন্ত্রণের শুষ্কতাটুকু গোপন করল না।

প্রফুল্লবাবু বললেন, 'তোমার মা এসেছেন ?'

সুতপা বলল, 'হ্যাঁ মা ভিতরে আছেন, আসুন।'

প্রফুল্লবাবু বাইরের ঘরে এসে বসলেন। বললেন, 'আজ গরমটা বড্ড বেশি। সেই যে সকাল থেকে গুমোট করেছে।'

সুতপা ফ্যানটি খুলে দিয়ে বলল, 'মাকে ডেকে দিচ্ছি।'

ডেকে দিতে হল না। সাধনা নিজেই এলেন বসবার ঘরে। প্রফুল্লবাবু উল্টো দিকের সোফায় বসলেন।

সুতপা চলে যাচ্ছিল, প্রফুল্লবাবু বললেন, 'যেয়োনা বোসো একটু।'

সুতপা বলল, 'মা ই তো আছেন।'

প্রফুল্লবাবু বললেন, 'শুধু মা থাকলেই হবে না। আজ তোমার কাছেই আমার দরকার।'

সুতপা অপ্রসন্ন হয়ে বলল, 'আমার কাছে !' সাধনা মেয়ের দিকে তাকিয়ে একটু অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে বললেন, 'উনি যখন বলছেন বোসনা একটু।'

মার পাশেই বসল সুতপা। তবে বেশ একটু ব্যবধান রেখে।

প্রফুল্লবাবু বললেন, 'তোমার কাছেই দরকার। আমার অপরাধ তো তোমার কাছেই।'

এবার সুতপার হাসি পেল। হেসে বলল, 'আপনার কী অপরাধ ?'

তার হাসি দেখে ভদ্রলোক একটু ঘাবড়ে গেলেন বোধহয়। ঘাবড়ে যান সুতপা তাই চেয়েছিল।

প্রফুল্লবাবু একটু অবাক হয়ে থেকে বললেন, 'তুমি কি জানো না দিলীপের কাণ্ড ? ও বুঝি তোমাদের কিছু জানায়নি ? হতভাগা। সব গোপন করেছে ?'

সাধনা একবার মেয়ের দিকে তাকালেন। তারপর প্রফুল্লবাবুর দিকে চেয়ে শান্তভাবে বললেন, 'না। প্রফুল্লবাবু ও আমাদের সব জানিয়েছে।'

প্রফুল্লবাবু বললেন, 'আমারও তাই মনে হচ্ছিল। ও আপনাদেরও জানাবে। কিন্তু কী কাণ্ড দেখুন। আমি তো ভাবতেই পারিনে আমার ছেলে হয়ে ও এমন নিষ্ঠুর এমন নির্মম হল কী করে!

আমার ছেলে হয়ে একটি নিরপরাধ মেয়েকে ও এমন করে আঘাত দিতে পারল ?'

যেন প্রফুল্লবাবুরই সান্ত্বনার প্রয়োজন। উনিই সবচেয়ে বেশি ভেঙে পড়েছেন।

সাধনা বললেন, 'আপনি কী করবেন বলুন। আমাদের ছেলে-মেয়ের ওপর আমাদের কতখানিই বা হাত আছে ? জন্মাবার আগে নিজেদের বাপ মা আমরা বেছে নিতে পারিনি। ছেলে মেয়ে জন্মাবার পর আমরা ভাবি আমরা তার শোধ তুলব। আমরা ওদের নিজেদের পছন্দমত গড়ে তুলব। কিন্তু তা কি হয় প্রফুল্লবাবু ? ওরা বড় হবার পর আমরা ওদের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে দেখি। ওরাও যেন আমাদের বাপ মার মত অ্যাকসিডেণ্টাল। ওরা যেন আমাদের হাতে গড়া নয়। আমাদের কিছুমাত্র ছাপ ওদের ওপর নেই। আমরা যেন দ্বিতীয়বার শিশু হয়ে ওদের ঘরেই জন্মেছি।'

অভিযোগটা যে কার বিরুদ্ধে সুতপার তা বুঝতে বাকি রইল না। অন্যদিন মার এসব কথার সে প্রতিবাদ করে। কিন্তু আজ চুপ করে রইল।

সাধনা বললেন, 'আপনি বসুন প্রফুল্লবাবু। আমি চা নিয়ে আসছি।'

সুতপা বলল, 'তুমি কেন যাচ্ছ ? আমি নিয়ে আসছি চা।'

সাধনা একটু হেসে বললেন, 'তুই কি আমার চেয়ে ভালো চা করতে পারিস ?'

সাধনা চলে যাওয়ার পরে প্রফুল্লবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। সুতপাও ভেবে পেল না কী বলে। এই করুণ কাতর, ছেলের কৃতকর্মের জন্যে লজ্জিত, দুঃখে অভিভূত প্রৌঢ় ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে তার করুণাও হল আবার একটু হাসিও পেল। সুতপা একবার ভাবল, ওকে বলে, 'প্রফুল্লবাবু অত কাতর হচ্ছেন কেন। ব্যাপারটা এমন কিছু নয়। আমাদের খানিকটা মনের মিল হয়েছিল আমরা কাছাকাছি এসেছিলাম। যখন দেখলাম সে মিল তত বড় মিল নয়, নিজেরাই দূরে সরে গেলাম। বিয়ের পরে যে এই কাণ্ড ঘটেনি সে বরং ভালোই হয়েছে। আপনি তাতে বেশি দুঃখ পেতেন। দিলীপের আগে আমিই যে একটা বিয়ে করে বসিনি

সে বরং ভালোই হয়েছে। আপনি তাতে আরো দুঃখ পেতেন।'

সুতপা ভাবল কঠিন শল্য চিকিৎসায় এই অসুস্থ অবসন্ন ভদ্রলোককে সুস্থ করে তোলে।

কিন্তু প্রফুল্লবাবুর বিষাদক্লিষ্ট মুখের দিকে তাকিয়ে তা ঠিক পেরে উঠল না।

প্রফুল্লবাবু বললেন, 'আমি বুঝতে পারছি সুতপা ব্যাপারটা একদিনে হয়নি। অনেকদিন ধরে তোমাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি গড়ে উঠেছে। কিন্তু তা মিটিয়ে নিলেই হত। তা কি মিটিয়ে নেওয়া যেত না সুতপা?'

সুতপা প্রফুল্লবাবুর দিকে তাকাল। তার হঠাৎ মনে হল এ যেন দিলীপেরই গলা। দিলীপেরই যেন এক অতি পুরোণ জীর্ণ সংস্করণ তার সামনে বসে আছে। দিলীপের অতীত আবার দিলীপের ভবিষ্যৎও। দিলীপও কি একদিন বুড়ো হয়ে তার কাছে এইভাবে আসবে? দাদু যেমন যান তাঁর সেই বান্ধবীর কাছে? দিলীপও কি একদিন এমনি করুণ অনুনয়ের ভঙ্গিতে বলবে, 'সমস্ত ভুল বোঝাবুঝি কি মিটিয়ে নেওয়া যেত না সুতপা?'

প্রফুল্লবাবু বলতে লাগলেন, 'তবু দিলীপের দায়িত্বই বেশি। তুমি কি তাকে বলেছিলে তুমি বিয়ে কর।'

সুতপা ঘাড় নাড়ল।

প্রফুল্লবাবু বললেন, 'তুমি কি তাকে বলেছিলে আমি তোমাকে ছেড়ে দিলাম। মুক্তি দিলাম।'

সুতপা ঘাড় নাড়ল।

প্রফুল্লবাবু বললেন, 'তবে? তবে তো তার দায়িত্বই বেশি। আমি কিন্তু কখনোই নিজে থেকে কাউকে ছেড়ে আসিনি সুতপা। যতদূর আমার মনে পড়ে আমি কোন বন্ধুকে আঘাত করিনি, আঘাত পেয়েছি। দুঃখ দিইনি, দুঃখ পেয়েছি। আমি যদি কারো কাছে কোন অপরাধ করে থাকি সে আমার অতিরিক্ত ভালোবাসার অপরাধ। যা আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল।'

প্রফুল্লবাবুর অতীত জীবন এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু সুতপা মুখ ফুটে সে কথা বলতে পারল না। নিজেরও যে কিছু দোষ আছে তাও স্বীকার করতে পারল না সুতপা। তার মনে হল তাও

এখানে অপ্রাসঙ্গিক। সুতপার মনে হল যে মেয়েটি অবনত মুখে প্রফুল্লবাবুর সামনে বসে আছে সে এক ভিন্ন মেয়ে। সে একান্ত ভাবেই মেয়ে। দিলীপ যাকে চেয়েছিল অথচ যে তাকে দেখতে পায়নি। একটি মেয়ে যে ভালোবাসা দিতে চেয়েছিল কিন্তু দিতে পারে না বলেই দিতে পারেনি। পেতে চেয়েছিল, কিন্তু নিতে জানেনা বলেই নিতে পারেনি। সেই ভালোবাসা দিতে না পারা, নিতে না পারার দুঃখে অভিভূত একটি মেয়েকে সুতপা নিজের মধ্যে অনুভব করল। এই প্রথম নেমে এল বিচ্ছেদের দুঃখে একটি অশ্রুসিক্ত মুহূর্ত।

প্রফুল্লবাবু আবেগরুদ্ধ স্বরে বলতে লাগলেন, 'তুমি সুখী হবে সুতপা, তুমি সুখী হবে। আমি আশীর্বাদ করছি। আমার আর তো কিছু করবার নেই শুধু আশীর্বাদই করতে পারি। আজকের এই দুঃখের কথা তোমার মনে থাকবে না। তুমি আবার ভালোবাসবে। স্বামী পুত্র নিয়ে ঘর সংসার করবে।'

তারপর যেন নিজের মনেই বলতে লাগলেন, 'ভালোবাসা। সারা জীবনে কতবার কতভাবে তার যাওয়া আসা। অভিজ্ঞতার কি কোন ছাপ থাকে? একেক সময় মনে হয় থাকে না। কিচ্ছু থাকে না। আবার মনে হয় থাকে, প্রতিটি অভিজ্ঞতাই আমাদের কিছু না কিছু দিয়ে যায়। কিছুই বৃথা যায় না।'

সুতপা ভাবল কে জানে এই অভিজ্ঞতার কোন দাম তার জীবনে থাকবে? অনেক অনেক দিন বাদে এই বিচ্ছেদ যন্ত্রণার অবসানে টুকরো টুকরো পাওয়ার মুহূর্তগুলিকে আবার সে কি ফিরে পেতে পারবে!

প্রফুল্লবাবু বললেন, 'ও কি সুতপা তুমি কি কাঁদছ? ছিঃ। এই দেখ। আরে তোমরা হলে এ যুগের—'

তিনি সস্নেহে তার পিঠে হাত রাখলেন।

সুতপার মনে হল একটি ভালোবাসার মৃত্যুশয্যায় আর এক শোকার্ত তার সঙ্গী হয়েছেন।

পর্দা সরিয়ে সাধনা এবারে ঘরে ঢুকলেন। সুতপা তাকিয়ে দেখল মা ট্রেতে করে চা আর খাবার নিয়ে এসেছেন।

এক হিসাবে আমার এখন সুখী হওয়া উচিত। একতলার মেসের ঘর থেকে আমি এখন সাততলা ফ্লাট বাড়িতে উঠে এসেছি। বসবাসের জন্যে বড় একখানা ঘর পেয়েছি। লেখাপড়ার জন্যে বিরাট সেক্রেটারিয়েট টেবিল। স্থায়ী চাকরি অবশ্য আমি পাইনি, কিন্তু একান্ত অস্থায়ী টুইশনের চেয়ে মিঃ দত্তগুপ্তের সেক্রেটারিগিরি করা মন্দ কি। যদিও মাইনে নিতান্তই কম। তবু এই একশ টাকা তো আমি তিনটে টিউশনি করেও সব সময়ে পেতাম না। তাছাড়া খাওয়াদাওয়ার স্ট্যাণ্ডার্ড এঁদের খুব ভালো। সস্তা হোটেল মেসে আমি যা খেতাম সে তুলনায় মিঃ দত্তগুপ্তের এখানে যা খাই সে তো রাজভোগ। খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে ওঁরা কোন আলাদা ব্যবস্থা করেন না। ওঁরা নিজেরাও যা খান আমাকেও তাই খেতে দেন।

এখান থেকে লেখাপড়ার সুবিধাও বেশ আছে। মিঃ দত্তগুপ্তের পার্সোনাল লাইব্রেরীটি বেশ ভালো। ল বুকসের যে সব কালেকসন সেগুলিতে অবশ্য আমার মোটেই আগ্রহ নেই। যদিও বিখ্যাত বিখ্যাত কেস হিস্টরির যে সব ভলিউম আছে সেগুলি উপন্যাসের মতই চিত্তাকর্ষক। কাব্য নাটক উপন্যাস বেশির ভাগই ইংরেজী কিংবা অন্যান্য ইওরোপীয় ভাষার ইংরেজী অনুবাদ। কিন্তু সেগুলি প্রায় সবই ঊনবিংশ কি বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের বই। দুচারখানা যে না পড়েছি তা নয় কিন্তু তেমন যেন রস পাইনি। প্রিয়গোপালবাবু নিজেই বলেন, 'ওহে দীপক উনিশ আর বিশে অনেক তফাৎ। উনিশে দর্শন সাহিত্য আর বিশে তোমাদের কারিগরি বিদ্যা। এ যুগটা আসলে মিস্ত্রী মজুরদের।'

অথচ মিঃ দত্তগুপ্ত নিজেও বিশ শতকের মানুষ। উনিশ শো এক সনে ওঁর জন্ম। কিন্তু ওঁর শিক্ষা দীক্ষা ধ্যান ধারণা সব যেন উনিশ শতকী আবহাওয়ার। মিঃ দত্তগুপ্তের সংগ্রহশালায় কিছু ধর্ম আর দর্শনের বইও আছে। কিন্তু সেগুলিতেও আমার আগ্রহ

কম। ওঁকেও ওসব বই বিশেষ নাড়াচাড়া করতে দেখি না। ইদানীং তাঁকে পড়তে দেখি গীতা মহাভারত শ্রীমদ্ভাগবত আর রবীন্দ্র রচনাবলী। রবীন্দ্রনাথ বলতে মিঃ দাশগুপ্ত আর তাঁর বন্ধুরা একেবারে পাগল। আমি কিন্তু তাঁর সব লেখা সব গান অমনভাবে উপভোগ করতে পারিনে, কিন্তু মিঃ দত্তগুপ্তের এই প্যাশন বড় ভালো লাগে। আমার নিজের মধ্যে ওই প্যাশনের অভাব আছে। আমি নিজে তীব্রভাবে কাউকে যেন ভালোবাসতে পারিনে। কিন্তু দূর থেকে অন্য কারো ভালোবাসা মাঝে মাঝে উপভোগ করি।

খাওয়া পরা সব দিক থেকেই আমি আগের চেয়ে অনেক ভালো আছি। আমার উন্নতি হয়েছে এ কথা যে কেউ বলবে। যে এই সেদিনও মাটির তলার চেয়ে একটু ওপরে ছিল সে আজ সাততলার উপরে বৃহৎ একটি ঘরে বাস করে। আমার তো সপ্তম স্বর্গ হাতে পাওয়া উচিত। কিন্তু তা পাচ্ছি কই?

আসলে এই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের একান্ত সচিবগিরি আমার পছন্দ হচ্ছে না। যদিও ইনি যথেষ্ট কালচারড, সুবিবেচক জজ হিসাবে বেশ সুনামের সঙ্গে কাজ করেছেন তবু ওঁর এই অনুক্ষণের সান্নিধ্য আমার কাছে অস্বস্তিকর মনে হয়।

কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি কী করছ?'

আমি হয় জবাব দিই, 'কিছুই করছি না' না হয় বলি, 'কিছু একটা করবার চেষ্টা করছি।'

আমার বন্ধু প্রণবও আমার মতই বেকার। টিউশনির ওপর নির্ভর করে দিন চালায়। বহু চেষ্টা করে কোন অফিসে কি স্কুল-টিস্কুলে কাজ জোটাতে পারেনি।

আমার চাকরির ধরনের কথা শুনে সে বলেছিল, 'তুই তো রাজার হালে আছিস দীপু। শুধু রাজকন্যাটি ছাড়া আর সবই পেয়েছিস। রাজভোগ, রাজশয্যা। আমার সঙ্গে জায়গা বদল করবি?'

আমি অবশ্য চট করে রাজি হতে পারিনি। প্রণবের কোন নির্দিষ্ট জায়গা নেই থাকবার। আজ কালীঘাটে পিসীর বাড়িতে কাল টালিগঞ্জে জেঠতুতো দাদার আশ্রয়ে, পরশু বউবাজারের এক ফার্নিচার ডিলারের দোকানে ওকে রাত্রিবাস করতে দেখা যায়।

ভোজন যত্রতত্র। প্রণব সরকারের তুলনায় আমি রাজার হালে আছি ঠিকই। তবু কোথায় যেন একটু মর্যাদায় বাধে। কোন ব্যক্তিবিশেষকে যে সার্ভ করে সে যেন সার্ভাণ্ট! আর কোন অফিস-টফিসে যে চাকরি করে সে সার্ভিস হোল্ডার। আসলে কথাটা ভাষার হেরফের ছাড়া কিছু না। কিন্তু আমরা কজনই বা কনভেন-সনের উপরে উঠতে পারি।

মিঃ দত্তগুপ্ত নিজেই আমাকে মাঝে মাঝে বলেন, 'ইয়ংম্যান আমি জানি তুমি অসুখী। এই অসন্তুষ্টি যুবকদের থাকবেই। মানুষ যখন মরোমরো হয় তখন আত্মপ্রসাদই তার সম্বল। যখন আর্টিস্টের মনে কোন অসন্তোষ থাকে না তখন দেখবে সে নিঃশেষ হয়ে গেছে। **Self complacence** হল শেষ শয্যা। সে কথা ঠিক। কিন্তু কেবল খুঁতখুঁত করলেও জীবনকে ভোগ করা যায় না। সাকসেসের একটি মূলমন্ত্র কি জানো? যা পাচ্ছ ব্যবহার কর, কাজে লাগাও। যেখানে তুমি পা রেখেছ, সেখানে নিশ্চয়ই তুমি আটকে থাকবে না। কিন্তু তাকে অবলম্বন করে তোমাকে ওপরের ধাপে পা ফেলতে হবে।'

এই ধরনের উপদেশ নির্দেশ প্রায় সবসময় আমাকে শুনতে হয়। টেপরেকর্ডার আছে। তাতে মাঝে মাঝে নিজের গলা তিনি টেপ করিয়ে রাখেন। এ তাঁর হবি। সেই টেপরেকর্ডার থেকে তাঁর বক্তৃতা কথোপকথন আমাকে আবার কাগজ কলমে লিখে রাখতে হয়। তাঁর ধারণা তাঁর এই সব সুভাষিতাবলী একদিন না একদিন সারা পৃথিবীর কাজে লাগবে। মাঝে মাঝে আমার মনে হয় ভদ্রলোক বড় বাতিকগ্রস্ত। তাঁর ছেলেমেয়েরা যে দূরে থাকে বোধ হয় এও একটা তার কারণ। নিজেকে ছাড়া তিনি যেন কাউকে ভালোবাসতে চান না, কি ভালোবাসতে পারেন না। কে জানে কারো ভালোবাসা পাননি বলেই তিনি এমন আত্মকেন্দ্রিক।

ওঁর স্ত্রী মিসেস দত্তগুপ্ত কিন্তু অন্যরকম। বেশ মোটাসোটা চেহারা। মিঃ দত্তগুপ্তের মত রোগা পিটপিটে ডিসপেপটিক পেশেণ্টের মত চেহারা নয়। কমবয়সী মেয়ে যদি স্থূলাঙ্গী হয় দেখতে খারাপ লাগে। কিন্তু যাঁরা বর্ষীয়সী তাঁদের যেন মোটাসোটা না হলে মানায় না। মিসেস দত্তগুপ্তেরও বেশির ভাগ

চুলই পাকা। সেই পাকা চুলের মাঝখানে তিনি মোটা করে সিঁদুর পরেন। পান খাওয়া অভ্যাস আছে। সারাদিন মুখে পান রাখেন। তাও যেন ওঁকে মানিয়ে যায়। খানিকটা জগদ্ধাত্রী জগদ্ধাত্রী ধরনের চেহারা। মাঝে মাঝে ইচ্ছা করে ওঁকে আমি মা বলে ডাকি। কিন্তু কেমন যেন লজ্জা করে। শুনেছি খুব ছেলেবেলায় আমার মা মারা গেছেন। যে মাসীমাকে মা বলে ডাকতাম তিনিও বেশি-দিন বাঁচেননি। দিদিমা একদিন বলেছিলেন, 'তুই আর কাউকে মা বলিসনে খোকন, তোর মুখের মা ডাক বড় অপয়া।' সেই দুঃখ অভিমান থেকেই হোক কি অন্য কোন নিগূঢ় কারণেই হোক মা ডাক আমার মুখে বড় একটা আসে না।

আমার যেন মনে হয় মিসেস দত্তগুপ্ত ভিতরে ভিতরে চান আমি ওঁকে মা বলে ডাকি। কিন্তু তিনিও মুখ ফুটে সে কথা বলতে পারেন না। এই গোপন ইচ্ছার কথা দুজনেই আমরা টের পাই। **clandestine relationship.** সেই গোপন সম্পর্ক শুধু যে প্রণয়ী যুগলের মধ্যেই থাকে তা নয়, অন্য কোন সম্পর্কেও থাকতে পারে।

মিসেস দত্তগুপ্তকে কেউ মা না বললেও আমাদের এই সাততলার পাঁচটি ফ্লাটের তরুণী গৃহিণীদের মধ্যে অনেকেই মাসীমা বলে থাকেন। তাঁদের ছেলে মেয়েরা তাকে দিদা কি দিদি বলে। তিনিও সবাইর খোঁজখবর নেন, অসুখ-বিসুখ হলে ছুটে যান সেবা পরিচর্যা করতে। আবার আনন্দ উৎসবের দিনেও তাদের সঙ্গে যোগ দেন।

মিঃ দত্তগুপ্ত কিন্তু অমন সামাজিক মানুষ নন। তাঁর রুচির সঙ্গে মতামতের সঙ্গে মিল আছে অমন মানুষ ছাড়া তিনি কারো সঙ্গে মিশতে পারেন না। তেমন সমধর্মী দুর্লভ। নিজের ঘরের মধ্যেই তাই নিজেকে তিনি বন্দী করে রাখেন। মাঝে মাঝে এসে চেয়ার পেতে বসে থাকেন হলঘরের মত লবিতে। সেখান থেকে উঁচু উঁচু বাড়িগুলির শুধু মাথা দেখা যায়। এই নিঃসঙ্গ মানুষটিকে দিন রাত্রির কিছু সময় আমাকে সঙ্গ দিতে হয়। চাকরির এই আমার বড় অঙ্গ।

আপাততঃ আমার মনিব দিবানিদ্রায় মগ্ন। আমার দুপুরে ঘুমোবার অভ্যাস নেই। এই সময়টায় আমি চাকরির চেষ্টায় বেরোই। সরকারী-বেসরকারী যে সব অফিসে অল্পস্বল্প চেনা

পরিচয় আছে সেগুলিতে কিছুদিন অন্তর অন্তর একবার করে হানা দিই। কোথাও কোন আশার বাণী শুনতে পাইনে। বয়স্ক ব্যক্তি হলে অযাচিত এবং বহু কথিত উপদেশ নির্দেশ পাই আর সমবয়সী যদি কেউ থাকে তারা চা সিগারেট খাওয়ায়। বেকার রয়েছি বলে সেই সঙ্গে কিছু সহানুভূতিও জোটে। আজ আমার তেমন যাওয়ার জায়গা ছিল না। এই বৃথা নিত্যকর্মপদ্ধতিতে মাঝে মাঝে বড় অপ্রবৃত্তিও বোধ করি। কী হবে গিয়ে? কী হবে চাকরিপ্রাপ্ত বন্ধুদের অনুকম্পা কুড়িয়ে? কেউ কেউ হয়তো ভাবে আমি চা সিগারেটের লোভেই ওদের কছে যাই।

শুয়ে শুয়ে চুপচাপ এলোমেলো একথা সেকথা ভেবে চলেছিলাম। সেই ভাবনার ওপর আমার হাত ছিল না। তার কোন মাথামুণ্ডুও ছিল না।

হঠাৎ আমাদের সদর দরজায় টোকা পড়ল। কলিংবেল আছে তবু টোকা। আগন্তুকের নিশ্চয়ই বুদ্ধি বিবেচনা আছে। দুপুর বেলায় কলিংবেল বাজিয়ে গৃহস্থের শান্তিভঙ্গ করতে চায় না।

এ বাড়িতে আপাততঃ আমিই দৌবারিক। দোরের সবচেয়ে কাছেই আমার ঘর। আর একটি ছোকরা চাকর আছে। বছর ষোল সতের হবে বয়স। এই দুপুর বেলায় সে বাড়ি থাকে না। খাওয়াদাওয়ার পাট মিটে গেলেই সে বেরিয়ে যায়। অন্য ফ্লাটের চাকর দারোয়ানদের সঙ্গে তাস খেলে, আড্ডা দেয়। চারটের আগেই ফিরে আসে। এসে চায়ের জল বসায়।

দোর খুলেই দেখি শ্যামলী। পাশের সমীরণবাবুদের ফ্লাটের রাঁধুনী কাম পরিচারিকা। কালো রঙের ওপর বেশ সুশ্রী চেহারা। টানা নাক চোখ। মিসেস মুখার্জি ওর ওপর যা এমন মাজাঘষা চালিয়েছেন যে ওকে আর সাধারণ রাঁধুনী বলে চিনবার জো নেই। শ্যামলী নিজেও সেই পরিচয় সহজে দিতে চায় না। বাইরে যখন বেরোয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে সেজেগুজেই বেরোয়। মিসেস মুখার্জি একদিন বলেছিলেন, 'এবার যদি দুখানা বই আর একটি খাতা ওর হাতে গুঁজে দিই তাহলে ওকে সহজেই কলেজের মেয়ে বলে চালিয়ে দিতে পারি।'

বলেছিলাম, 'দিন না বউদি, তাহলে সত্যিই একটা কাজের মত

কাজ হয়।'

রুনু বউদি বলেছিলেন, 'ওরে বাবা তাহলে আমাকেই সারাদিন হাতাখুন্তি নিয়ে পড়ে থাকতে হবে। দাসী হয়ে বসবে পাটরানী।'

নিজের মনেই হেসেছিলাম। বউদির আসল ভয়টা কোনখানে এবার তা বোঝা গেল।

শ্যামলী চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে দেখে আমি বললাম, 'কী ব্যাপার শ্যামলী?'

'বউদি আপনাকে ডাকছেন।'

'কেন?'

'ওঁর সেই মহিলা সমিতির মেয়েরা এসেছে।'

'সেখানে আমি গিয়ে কী করব?'

শ্যামলী বলল, 'তা তো জানি না। বউদি বললেন আপনাকে খুব দরকার।'

বললাম, 'আচ্ছা যাও। বলো আসছি।'

শ্যামলী মৃদু হেসে চলে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে একটু রাগ হল। হাসল কেন শ্যামলী? ও কি মনে করেছে ওর মনিবানীর হুকুম তামিল না করার সাধ্য আমার নেই? আমি এতই নারীসঙ্গপ্রিয় যে ওই মেয়ে মজলিসে গিয়ে আমাকে হাজিরা দিতেই হবে? তাছাড়া যদি এতই তাঁর দরকার রুনু বউদি নিজে এসে আমাকে ডেকে নিলেই পারতেন। ঝিকে পাঠালেন কেন?

আলনায় হাফশার্টটা ঝুলছে। সেটা গায়ে দেবার আগে আমি মিনিট কয়েক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবলাম, যাব কি যাব না। তারপর ভাবলাম যাওয়াই ভালো। গিয়েও তো বুঝিয়ে দেওয়া যায় আমি আসিনি। কিছু কিছু অবলিগেশন রুনু বউদিদের কাছে আমাদের আছে। আমাদের মানে আমি আর আমার মনিব মিঃ দত্তগুপ্তের। মুখার্জিদের টেলিফোন আছে। সেই ফোন আমাদের ওঁরা ব্যবহার করতে দেন। আমার নিজের ফোন বড় একটা আসে না। কেই বা করবে। কিন্তু প্রিয়গোপালবাবুর ফোন প্রায়ই আসে। আমাকেই গিয়ে ছুটে ছুটে ফোন-ধরতে হয়। প্রিয়গোপালবাবুর কোন

ফোন-টোন থাকলে আমি গিয়ে করে আসি। নিজে যান না। আগের বাড়িতে তাঁরও ফোন ছিল। কিন্তু নতুন ফ্লাট কিনে পাড়া বদল করবার পর নতুন কানেকসন আর পাননি। আমাকে তাই নিয়ে লেখালেখি করতে হচ্ছে। অবশ্য মুখে মুখে তিনি বলে যান। আমি তাঁর কথাই কলমের মুখে ধরে রাখি। যৎ শ্রুতং তল্লিখিতং, আমার নিজের কোন বক্তব্য নেই, মন্তব্য নেই, ব্যক্তিগত কোন কাজ কর্ম নেই। গীতার কথা একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেছি। যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি। প্রিয়গোপালবাবুর সৌজন্যে গীতা শ্রীমদ্ভাগবতের সঙ্গে আমার অল্পস্বল্প পরিচয় হয়েছে। মানে একখানা আধখানা শ্লোক আমিও তোতাপাখির মত আওড়াতে পারি। আমার বয়সী আমাদের যুগের ছেলেরা ওসব বই হাত দিয়েও ছোঁয় না তা আমি জানি।

রুনু বউদিদের সঙ্গে বাধ্যবাধকতা আমাদের শুধু ফোনের জন্যেই নয়। ওঁরা খুব সৎ প্রতিবেশী। গেলে চা-টা দেন, হাতের কাজ ফেলে গল্পটল্প করেন। এই ফ্লোরে আমাদের যে আরও তিন ঘর পড়শী আছেন তাঁরা অতটা সামাজিক নন। অনেকেই শুধু মুখ চেনা। কিন্তু মুখার্জিদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় ঘনিষ্ঠতা আরো খানিকটা এগিয়েছে। তাছাড়া চাকরি-বাকরির ব্যাপারে সমীরণবাবুর কাছেও আমি কিছুটা আশা রাখি। যদিও ওঁর লাইন সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি কমার্শিয়াল আর্টিস্ট। একটি পাবলিসিটি অফিসের মালিক। আমি ও সব ব্যাপারের কিছুই জানি না। একটা লাইন সোজা করে আঁকতে পারি না। তবু ওঁর মত একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির কত রকমের কত সোর্স থাকতে পারে। কত জনের সঙ্গে কত আলাপ পরিচয়। তাঁকেও আমি ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছি। যদি চাকরি-বাকরির কোন সুযোগ সুবিধা ঘটে—। তিনি বলেছেন 'নিশ্চয়ই, আমার ওখানে তো কিছু এখন খালি নেই, তবে অন্য কোথাও সুযোগ সুবিধা হলে তোমার জন্য নিশ্চয়ই চেষ্টা করব।'

সমীরণবাবু প্রথম প্রথম আমাকে আপনিই বলতেন। তারপর তুমি বলতে শুরু করেছেন। অবশ্য বলবার আগে আমার অনুমতিও নিয়েছেন, 'তোমাকে তুমিই বলব দীপক। বয়সে তুমি অনেক

ছোট। আপনি বলতে নিজেরই কেমন বাধো বাধো লাগে।'

আমি হেসে বলেছি, 'বাঃ তুমিই তো বলবেন। এতদিন আপনি আপনি করছিলেন। আমারই কানে লাগছিল।'

সমীরণবাবু জবাব দিয়েছেন, 'কিন্তু তুমি তো নিজে থেকে বলনি।'

সমীরণবাবু নিজে তো আমাকে তুমি বললেনই তাঁর স্ত্রীকেও বলে দিলেন তুমি বলতে। 'অত আসুন বসুনের দরকার কি, দীপককে তুমি বললেই হয়। বয়সে কত ছোট।' তারপর হেসে বললেন, 'সম্বোধনটা যত অন্তরঙ্গ হবে, সম্পর্কও তত ঘনিষ্ঠ হবে বুঝেছ ?'

সেই থেকে আমি ওঁদের দুজনের কাছেই তুমি হয়ে রয়েছি। আসা যাওয়ায় খোঁজখবর দেওয়া-নেওয়ায় কিছু ঘনিষ্ঠতাও হয়েছে। আর ঘনিষ্ঠতার দাবিতে আমাকে দিয়ে রুনু বউদি এটা ওটা করিয়েও নেন। আমার ওপর তাঁর যে আধিপত্য আছে সেটা আরো পাঁচজনকে দেখানোই যেন তাঁর উদ্দেশ্য। আমার আর একটা মন বলে কী দরকার আমার এত মেলামেশায়। আমার মা নেই, বাবা নেই, আপন ভাইবোন কেউ নেই। মাসী পিসীরা যাঁরা আছেন তাঁদের স্নেহের বন্ধনেও তো আমি স্থায়ীভাবে ধরা দিইনি। যারা একান্তই পর তাদের সঙ্গে কেন তাহলে এত মেলামেশা করতে যাই ? কিন্তু এসব ভাবলে কি হবে যাদের কাছে একটু স্নেহ ভালবাসা পাই, আমি তাদের সঙ্গ ছাড়তে পারিনে।

হাফশার্টটা গায়ে দিয়ে রুনু বউদির ফ্লাটে গিয়ে হাজির হলাম।

সামনের বড় লবিটাতে ততক্ষণে ওদের মহিলা মজলিস প্রায় জমে উঠেছে। অবশ্য সদস্যার সংখ্যা মাত্র চার। রুনু বউদি ছাড়া আমাদের এই ফ্লোরের দুজন মহিলা আছেন। তিনজনই প্রায় সমবয়সী, তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে হবে বয়স। এমনভাবে সেজে টেজে থাকেন, মনে হয় আরো কমবয়সী। আজ আরো একটি নতুন মেয়েকে দেখলাম। শ্যামবর্ণ দীর্ঘাঙ্গী। লম্বাটে ধরনের মুখ। একটু যেন বিষণ্ণ আর গম্ভীর। বয়স আমার মতই। চব্বিশ পঁচিশ বছরের বেশী হবে বলে মনে হয় না।

আমি ঘরে ঢুকতেই রুনু বউদি বললেন, 'এই যে আমাদের

সেক্রেটারি এসে গেছে।'

আমি বললাম, 'কিসের সেক্রেটারি?'

রুনু বউদি বললেন, 'কেন আমাদের ক্লাবের?'

খানিকটা দূরত্ব রক্ষা করে আমি নয়া সোফাটার এক পাশে বসলাম। হেসে বললাম, 'আপনাদের তো মেয়েদের ক্লাব।'

রুনু বউদি বললেন, 'হলই বা মেয়েদের ক্লাব। সেক্রেটারি হিসাবে আমাদের একজন ছেলে চাই। কোন কোন ব্যাপারে পুরুষের সাহায্য আমাদের নিতেই হয়। এখন পর্যন্ত তো তোমরাই সমাজটাকে বগলদাবা করে রেখেছ। দেখনি মেয়েদের স্কুলেও একজন পুরুষকেই অ্যাকাউনট্যাণ্ট হিসাবে রাখা হয়।'

হেসে বললাম, 'দারোয়ান বেয়ারাদের কাজও আমরা এই অধমরাই করি। কিন্তু আপনাদের ক্লাবের সেক্রেটারি হবার যোগ্যতা কি আমার আছে! অত গুরু দায়িত্ব আমি কি বইতে পারব?'

রুনু বউদি বললেন, 'ঠাট্টা হচ্ছে? দায়িত্বটা কিন্তু কোন অংশে কম নয়। ওই বুড়ো ভদ্রলোকেরপি. এ. হিসাবে তুমি যা করছ তার চেয়ে অনেক বেশী দায়িত্ব। ওখানে তো তুমি দিব্যি ফাঁকি মারছ।'

সাঁইত্রিশ নম্বর ফ্লাটের মিসেস হালদার বললেন, 'ও কথা বলো না রুনুদি। উনি শুনতে পেলে দীপকবাবুর চাকরি থাকবে না।' রুনু বউদি বললেন, 'ভারী তো চাকরি। ওর চেয়ে ভালো চাকরি আমরা দীপকবাবুকে দিতে পারব। তাছাড়া সারাদিন ওই বুড়ো ভদ্রলোকের ধমক খাওয়া আর বকাবকি শোনার চেয়ে মহিলাদের সেবাযত্ন করতে ওর ভালোই লাগবে। ভালো কথা, আমাদের এই নিউকামারের সঙ্গে তোমার তো আলাপ করিয়েই দেওয়া হয়নি। দীপক, এ হল শম্পা গুহরায়। তোমার মিসেস হালদার মানে শর্মিষ্ঠার বোন।'

সেই দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রুনু বউদি বললেন, 'আর শম্পা এর পরিচয় তো পেলেই। দীপক বসু মজুমদার। আমাদের ক্লাবের অনারারী সেক্রেটারি।'

বললাম, 'আমি আবার মজুমদার হলাম কবে?'

রুনু বউদি বললেন, 'এই টাইটেলটা ক্লাব থেকে তোমাকে দিলাম। এই হল অনারারি সেক্রেটারির প্রথম অনার। সেক্রেটারি,

শম্পা গুহরায়ের নামটাও তুমি এনলিস্ট করে নিয়ো।'

এমন একটা কৌতুকের ভঙ্গীতে রুনু বউদি কথাগুলি বললেন যে সমস্ত ব্যাপারটাই উপভোগ্য হয়ে উঠল। উনি ডাকামাত্রই যে আমি এসে হাজির হই সে এই জন্যেই। নীরস জীবনে রুনু বউদি রসের সঞ্চার করতে পারেন। নৈরাশ্যের মূলে আশার বারি সিঞ্চন।

আমি বললাম, 'শম্পা গুহরায় কি মেম্বারশিপের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করেছেন?'

রুনু বউদি বললেন, 'আমাদের তো এখনো খাতাপত্র কেনা হয়নি। আমরা মৌখিক আবেদনপত্রই গ্রহণ করে থাকি। এমন কি লজ্জায় কেউ যদি মুখ ফুটে না বলতে পারে তার মানসিক আবেদনও বিবেচনা করা হয়।'

রুনু বউদি একবার শম্পার মুখের দিকে আর একবার আমার মুখের দিকে তাকালেন।

শম্পার হয়ে তার দিদিই জবাব দিলেন, 'মৌখিক মানসিক কোন আবেদনপত্রই শম্পা করে উঠতে পারবে না রুনুদি। ও তো আর এখানকার বাসিন্দা নয়, কদিনের জন্যে আমার কাছে বেড়াতে এসেছে। নিউ ব্যারাকপুরের মেম্বার নিয়ে আমাদের লাভ কি?'

রুনু বউদি বললেন, 'নিউ ব্যারাকপুরই হোক আর ওল্ড বালিগঞ্জই হোক আমরা যেখানে পাব সেখান থেকেই মেম্বার নেব। সবাইকেই যে এই পাম এভেনিয়ুর বাসিন্দা হতে হবে তার কোন মানে আছে নাকি? শম্পা, তুমি কি বল?'

শম্পা বলল, 'দিদি যা বলছে তাই ঠিক। আপনাদের মিটিং-গুলিতে আমি তো আর নিয়মিত আসতে পারব না। যখন আসব একটা গেস্ট কার্ড আমাকে দেবেন তা হলেই হবে। যেখানেই থাকি মানসিক যোগাযোগ তো আপনাদের সঙ্গে থাকবেই।'

রুনু বউদি আমার দিকে তাকালেন, 'শুনলে তো? আর কোন প্রতিশ্রুতি তুমি চাও? মানসিক যোগাযোগের চেয়ে আর কোন কমিউনিকেশনের জোর বেশী? মনোরথের সঙ্গে কোন জেট প্লেন পাল্লা দিয়ে উড়তে পারে?'

বললাম, 'তাহলে শম্পা গুহরায়কে আমরা ক্লাবের মেম্বার করে নিলাম।'

শম্পা মৃদু প্রতিবাদ করে বলল, 'না না।'

রুনু বউদি বললেন, 'Double negative makes one affirmative—একথা আমরা সবাই জানি।'

বললাম, 'তা তো হল। কিন্তু ক্লাবের নাম কি রেখেছেন বউদি ?'

'বা রে, নাম রাখবার ভার তো তোমার ওপর ছিল। তোমাকে সেই কবে বলে রেখেছি।'

বললাম, 'এখনো নামই রাখেন নি ? এখনো আপনাদের ক্লাব অনামিকা ?'

রুনু বউদি বললেন, 'বাঃ, এই তো একটা নাম বেরিয়ে গেল অনামিকা। নাম নেই সেও একটা নাম। ক্লাবের নাম অনামিকাই থাক কী বল তোমরা ?'

সদস্যারা বললেন, 'বেশ তো।'

আর একটি মহিলা এতক্ষণ বিশেষ কোন কথা বলেন নি। তিনি হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'এবার আমি যাই রুনুদি। ছেলে আছে স্কুলে। তাকে আনতে যেতে হবে। এই এক নতুন চাকরি হয়েছে।'

রুনু বউদি বললেন, 'আহা বোসো বাসবী বোসো। ছেলে মেয়ে আমাদেরও স্কুলে গেছে। আমরাও আনতে যাব। এখনো তার ঢের দেরি। বোসো এক কাপ চা খেয়ে যাও।'

তারপর পিছনের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কিচেনের দিকে তাকিয়ে রুনু বউদি একটু উঁচু গলায় বললেন, 'কিরে শ্যামলী, তোর চা হল ?'

শ্যামলী পর্দার আড়াল থেকে জবাব দিল, 'যাই বউদি।' রুনু বউদি বললেন, 'এই শ্যামলীর কথাই ধরো না। ওর নামের ওপর আমি কেমন কারিকুরি করেছি শোন। বসিরহাটের গ্রাম থেকে ও যখন প্রথম আসে ওর নাম ছিল শ্যামি। বোধহয় শ্যামারই অপভ্রংশ। আমি বললাম ওসব শ্যামি ট্যামি চলবে না। তোমার নাম রাখলাম আমি শ্যামলী। ভালো হয়নি নামটা ?'

বললাম, 'খুবই ভালো হয়েছে। কিন্তু আপনি কি ওর নামেরই সংস্কার করেছেন বউদি ?'

রুনু বউদি বললেন, 'তাই কি হয় ? তুমি ভাব কি আমাকে ?

নামটা যাতে মানানসই হয় তা দেখতে হবে না? সাত আট মাস আগে ও যখন আমার কাছে আসে ও ছিল একটা ভূত। কথা বলতে জানত না। সবাইকে তুমি তুমি করে ডাকত। উচ্চারণে ছিল খুলনা যশোরের টান। আমি ওর নিজের জিভের সংস্কার করতে লেগে গেলাম। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা জানত না, ভালো করে শাড়িখানা পরতে পারত না, চুল বাঁধতে জানত না। আর রান্নাবান্না যা ছিল মা গঙ্গাই জানেন। আমি ওকে হাতে ধরে ধরে সব শিখিয়েছি। এখন ও সব পারে। তারপর ঘষামাজার পর চেহারাখানা কেমন দাঁড়িয়েছে দেখেছ? আরো কদিন যাক তারপর এখানে যে সব ঋষ্যশৃঙ্গরা আসেন, ওকে দেখে যদি অস্থির না হয়ে ওঠেন আমি কি বলেছি।'

রুনু বউদি আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। চট্ করে কোন জবাব আমার মুখে এল না।

সুন্দর ফুলকাটা একটি কাঠের ট্রেতে করে শ্যামলী চার পাঁচ কাপ চা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। ট্রেখানা রাখল সেণ্টার টেবিলের ওপর।

চায়ের কাপগুলি বেশ সুদৃশ্য। শ্বেত পদ্মের মত দেখতে। রুনু বউদি সেগুলি আমাদের হাতে তুলে দিচ্ছিলেন কিন্তু আমরাই এগিয়ে এসে যে যার কাপ নিলাম। শম্পা একটু দূরে বসেছে বলে কাপটা আমি তার হাতে তুলে দিলাম।

রুনু বউদি বললেন, 'সেক্রেটারির এই পক্ষপাতটুকু আমরা নোট করে নিচ্ছি।'

লক্ষ্য করলাম শ্যামলীও আমার এই চা পরিবেশনটুকু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। সবাই হাসল শ্যামলী কিন্তু হাসল না। ওর সুশ্রী সুডোল মুখখানা একটু যেন ক্লিষ্ট দেখাল। আমি মনে মনে হাসলাম, মেয়ে মাত্রেই হিংসুটে। নাকি মানুষ মাত্রেই হিংসুটে।

শম্পা হেসে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'থ্যাঙ্কস। আপনার অত কষ্ট করবার দরকার ছিল না।'

রুনু বউদি বললেন, 'তুমি জানো না শম্পা, কেউ কেউ কষ্ট করবার সুযোগ না পেলে কষ্ট পায়।'

আমি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললাম, 'চারটে বাজে প্রায়। আমি

উঠছি, আপনারা বসুন।'

রুনু বউদি বললেন, 'আমরাও উঠব। তুমি চলে গেলে সভার আর থাকবে কি। আজকের মত সভা ভঙ্গ। সেক্রেটারি, তোমার কিন্তু নিত্য হাজিরা চাই। গরহাজির হলে চাকরিটি যাবে।'

আমি স্মিতমুখে উঠে দাঁড়ালাম। রুনু বউদির সব কথার জবাব দেওয়া যায় না। জবাব দেওয়ার চেষ্টাও করিনে। মহিলাটি যে কিছু বেশী মাত্রায় প্রগলভ তা স্বীকার করতেই হয়। তবু এই রূপবতী একটি সচ্ছল সংসারের গৃহিণীর হৃষ্টতা দেখতে আমার ভালো লাগে। মনে হয় রুনু বউদি যেন নিজের মধ্যে নিজেই পরিপূর্ণ। যেন একটি আনন্দের ঝরনা। না ঠিক ঝরনা বলা যায় না। বরং একটি তরঙ্গিনী নদী বলাই ভালো। সেই নদী রঙ্গকৌতুকের ঢেউয়ে দুই তীর প্লাবিত করে বয়ে চলেছে। কোন অভাব অনটন নেই। স্বামীর যে ফার্ম আছে তাতে নিশ্চয়ই খুব ভালো ইনকাম হয়। নইলে সত্তর আশি হাজার টাকা ব্যয় করে এখানকার একটি ফ্ল্যাট কিনবেন কী করে? যদিও সব টাকা নগদ দিতে হয়নি, অর্ধেক নাকি এঁরা কিস্তিতে কিস্তিতে দিয়ে থাকেন, তবু সমীরণ মুখার্জি যে অর্থবান মানুষ তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। দুটি ছেলে মেয়ে আছে ওঁদের। বেশ সুশ্রী স্বাস্থ্যবান। স্কুলে পড়ে। রুনু বউদিকে দেখে মনে হয় ওঁর কোন দুঃখকষ্ট নেই। পৃথিবীতে কারো যে কোন অভাব অনটন থাকতে পারে তাও যেন উনি মানেন না, কি মনে আনতে চান না। বেশ আছেন ভদ্রমহিলা।

টাইপ করা খান দুই চিঠিতে নাম সই করতে করতে মিঃ দত্তগুপ্ত বললেন, 'বাস, হয়ে গেল তোমার সারাদিনের কাজ। একটু ডিকটেশন নেওয়া একটু টাইপ করা! তারপর সারাদিন শুয়ে বসে আর মেয়েদের সঙ্গে গল্প করে কাটানো। বেশ আছ দীপকচন্দ্র।'

রুনু বউদিদের আড্ডায় আমার যে ডাক পড়ে, আমি যে সেখানে গিয়ে চা খাই গল্প করি ওঁদের তাস খেলার সঙ্গী হই, প্রিয়গোপাল-

বাবু তা খুব পছন্দ করেন না। কিন্তু সরাসরি আমাকে ওখানে যেতে নিষেধ করতেও পারেন না। বরং উলটো কথাই বলেন, 'তুমি তো যাবেই। তোমার যা বয়স তাতে বৃদ্ধের চেয়ে বনিতার সঙ্গই তো তোমাকে বেশী টানবে।'

মিসেস দত্তগুপ্ত একটু দূরে একটা মোড়ার ওপর বসে নাতির জন্যে একটা জামা সেলাই করছিলেন। স্বামীর দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'তুমিও যাও না। দূরে বসে হা হুতাশ করে লাভ কি।'

প্রিয়গোপালবাবু বললেন, 'আজ তুমি কত সহজে ছাড়পত্র দিচ্ছ। কিন্তু যখন আমার দিনকাল ছিল একেবারে কচ্ছপের মতন আঁকড়ে ধরে রেখেছিলে। গৃহীতার্থং ন মুচ্যতে নারী বর্বর কচ্ছপাঃ।'

মিসেস দত্তগুপ্ত বললেন, 'হ্যাঁ আঁকড়ে ধরে যেন তোমাকে কতই রাখতে পেরেছি। তুমি যা করবার করেছ। জীবনভর নিজের ইচ্ছা মতই তো চললে। আর কারো ইচ্ছার, আর কারো সুখ-শান্তির কোন দাম কি তোমার কাছে আছে না কোন দিন ছিল?'

বেশীক্ষণ বসলেন না মিসেস দত্তগুপ্ত। তাঁর হাতের কাজ নিয়ে তিনি অন্যঘরে চলে গেলেন। আমার মনে হল পাছে ওঁদের দাম্পত্য জীবনের অশান্তির কথা আমার কাছে আরও বেশী উৎঘাটিত হয়ে পড়ে সেই জন্যেই তিনি সরে গেলেন। ভদ্রমহিলা অমনিতে বেশ হাসিখুশি, সামাজিক, সাধ্যমত পাড়াপড়শীর উপকার করেন কিন্তু স্বামীর কাছে এলেই অন্যরকম হয়ে যান। তাঁর যত ক্ষোভ দুঃখ অসন্তোষ যেন পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে। বুঝতে পারি না ব্যাপারটা কি। বোঝবার জন্যে খুব একটা মাথাও ঘামাইনে। এই বৃদ্ধ বৃদ্ধার অতীত জীবন সম্বন্ধে আমার কোন কৌতূহল নেই। ওঁদের দাম্পত্য কলহ মনোমালিন্য আমার কাছে সম্পূর্ণ তাৎপর্যহীন। জানি না ওঁদের ছেলেমেয়েদের কাছেও তার কোন অর্থ আছে কিনা। চল্লিশ কি পঁয়তাল্লিশ বছর প্রায় অর্ধ শতাব্দী যাঁরা এক সঙ্গে কাটিয়েছেন জীবনের বাকী কয়েক বছরও তাঁরা একই ভাবে কাটাবেন। ওঁদের ঝগড়াঝাটি কারো মিটিয়ে

দেবার দরকার হয় না। তা আপনিই মেটে।

প্রিয়গোপালবাবু আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন, 'আমার স্ত্রীর সঙ্গে তুমি যদি খানিকক্ষণ আলাপ কর তাহলে তোমার মনে হবে জোয়ান বয়সে আমি একজন ডন জুয়ান ছিলাম। আর স্বেচ্ছাচারিতায় একাধিপত্যে আমি নিরো আর নেপোলিয়ানকেও হার মানিয়েছি। তোমার কী মনে হয়, আমি কি একজন স্বভাব দুর্বৃত্ত ?'

মৃদুস্বরে বললাম, 'আমি কী করে বলব বলুন ?'

তিনি বললেন, 'বলই না। অপ্রিয় সত্য সহ্য করবার ক্ষমতা আমার আছে। তাতে তোমার চাকরির কোন ক্ষতি হবে না। আমি তোমাকে আমার বন্ধু বলে নিয়েছি। তুমি তোমার বান্ধবীদের বয়ফ্রেন্ড, আমার বয়স্য।'

এ ধরনের কথা প্রিয়গোপালবাবু আগেও কয়েকবার বলেছেন। কিন্তু এই রকম বন্ধুত্বে আমার বিশ্বাস কম। কাজে সামান্য একটু ত্রুটিবিচ্যুতি হলে উনি বকাবকি করেন, মেজাজ দেখান। কিছুতেই ভুলতে দেন না উনি প্রভু আমি ভৃত্য। তাছাড়া আমার প্রায় ঠাকুরদার বয়সী এই বুড়ো ভদ্রলোকের সঙ্গে আমি কোথাও কোন রকম মিল খুঁজে পাইনে। আমি ওঁর বন্ধু হব কী করে ?

প্রিয়গোপালবাবু আমার দিকে একটুকাল তাকিয়ে রইলেন তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'বুঝতে পেরেছি ইয়ংম্যান, আমার বন্ধুত্ব তুমি চাও না। তুমি আমাকে ভালোবাস না।'

একটু হেসে বললাম, 'আমি আপনাকে ভক্তি করি, শ্রদ্ধা করি।'

প্রিয়গোপালবাবু বললেন, 'তার চেয়ে পরিষ্কার করে বল না কেন বাবা আমি আপনাকে ভয় করি। আমার এক কথায় তোমার ওই একশ টাকার ইনকামের প্রথম অঙ্কটা মুছে গিয়ে শুধু দুটো শূন্য হয়ে থাকতে পারে। শুধু একশ টাকাই বা বলি কেন। এখানে তুমি যে ভাবে আছ এই স্ট্যাণ্ডার্ডে বাইরে থাকতে গেলে তিনশ টাকাতেও কুলোয় না। তুমি যত খুঁতখুঁত কর না তোমার রিয়াল ওয়েজ এখানে চার পাঁচশো টাকা। এখন তোমাকে যদি রাস্তায় নামিয়ে দিই এই টাকা রোজগার করা তোমার পক্ষে খুব সহজ হবে না দীপকচন্দ্র।'

আমি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলাম। এই ওঁর উদারতা? এই রকম পাইফাদিং এর হিসাব করে উনি আমার বন্ধুত্ব চান? কী ভাবেন উনি আমাকে? উনি কিসের ভয় দেখান? আমি এই মুহূর্তে ওঁর চাকরি ছেড়ে দিতে পারি। কারো ওপর আমার কোন দায়-দায়িত্ব নেই। আত্মসম্মান হারিয়ে একমুহূর্তও আমি কোন চাকরি করব না। একশ টাকার কেন হাজার টাকার চাকরি হলেও করব না। আজ এখানে আছি দুবেলা মাছ মাংস ঘি দুধ খাচ্ছি। দরকার হলে আমি ডালভাত কি আলুভাতে ভাত খেয়েও থাকতে পারি। কিন্তু মিঃ দত্তগুপ্ত তা পারবেন না।

তাঁর কথার জবাবে আমি বললাম, 'বেশ তো আপনার যদি মনে হয় আমার জন্যে আপনি বেশী ব্যয় করছেন আপনার লোকসান হচ্ছে, আমাকে বলে দিন আমি চলে যাই।'

মিঃ দত্তগুপ্ত উঠে এসে আমার কাঁধে হাত রাখলেন। এক মুহূর্তেই তিনি বদলে গেছেন। কী প্রসন্ন কী অমায়িক তাঁর মুখ।

তিনি হেসে বললেন, 'ওই দেখ, অমনি তুমি চটে গেলে? তুমি বয়সে যুবক জাতে পুরুষ। কিন্তু কিছু মনে কোরো না, মান অভিমানটা তোমার ঠিক মেয়েদের মত। হবে না কেন? তোমার ছোটখাটো চেহারার মধ্যেও নারীসুলভ একটি কান্ত কমনীয় ভাব আছে। আমি একজন লেডী সেক্রেটারি রাখব ভেবেছিলাম, কিন্তু তার আর দরকার হয়নি।'

হয়তো ঠাট্টা। দাদুর বয়সী এই ভদ্রলোক নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে ঠাট্টা তামাশা করতে পারেন। কিন্তু ওঁর সঙ্গে আমার দাদু-নাতির সম্পর্ক নয়। এ ধরনের কথাবার্তা আমার কাছে অরুচিকর মনে হয়। আমার চেহারায় নারীসুলভ নমনীয়তা আছে একথা শুনে আমি মোটেই খুশী হলাম না। আমি দুদিন অন্তর দাড়ি কামাই। আমার সমবয়সী কেউ কেউ আজকাল দাড়ি রাখছে। রুনু বউদিদের কাছে বিনা দাড়িতেই আমার পৌরুষ প্রমাণিত হয়েছে। এই বুড়ো ভদ্রলোকের জন্যে আমি কি চাপদাড়ি রাখতে শুরু করব নাকি?

মিঃ দত্তগুপ্ত বললেন, 'আবার রাগ হল? তোমার কান্তিতে

মেয়েলীভাব আছে বলেছি বলে অপমান হল তোমার? আরে তুমি কি একাই অর্ধ-নারীশ্বর নাকি? আমরা সবাই তাই। আধখানা নারী আধাখানা পুরুষ। ললিতে কঠোরে গড়া। মেয়েদের যে শুধু আমরা লাবণ্যপুঞ্জ বলে ভাবি, লতার সঙ্গে নদীর সঙ্গে তুলনা দিই সেটা আমাদের কল্পনা। বাস্তব জগতে তুমি যদি ওই ধারণা নিয়ে চল, তোমাকে পদে পদে হোঁচট খেতে হবে। কখনো বা মুখ থুবড়ে পড়েও যেতে পার, বলা যায় না।'

আমি বললাম, 'আমার হোঁচট খাওয়ার ভয় নেই। মেয়েদের আমরা ও রকম ভাবিই না। আপনাদের যুগে বোধহয় ওসব ছিল। কবিতা কল্পনালতা। আমরা জানি মেয়েরা আমাদের মতই রক্ত-মাংসে গড়া। ক্ষিদে তেষ্টায় ভরা, আমাদের মতই তাদের মনে হিংসা দ্বেষও আছে, স্নেহ ভালোবাসাও আছে।'

নিজের বক্তব্য জোর গলায় স্পষ্ট ভাষায় বলতে পেরে আমি তৃপ্তিবোধ করলাম। হ্যাঁ, এইবার আমি ওঁর বন্ধুর আসনে বসতে পেরেছি। বয়সের বৈষম্য আর্থিক অসাম্য আলোচনার আসরে কিছুই আমি আর গ্রাহ্যের মধ্যে আনছি না। দত্তগুপ্ত মশাই দেখুন আমি শুধু মহিলা মজলিসের মানুষ নই। আশা করি আমার পৌরুষ সম্বন্ধে উনি আর দ্বিতীয়বার কটাক্ষ করবেন না। পৌরুষ শুধু মুষ্টিযুদ্ধে আর বকসিংএ আছে বলে আমি বিশ্বাস করিনে। টাকার থলির মধ্যেও নেই।

অফিসে কাজ না করলেও অফিস বসদের কথা আমি জানি। কিছু কিছু বন্ধুদের কাছে শুনেছি তাদের হাবভাব দেখে বাকীটা বুঝেও নিয়েছি। বসদের কাছে ওরা তটস্থ। **Yes sir, No sir** ছাড়া একটা কথাও বলতে পারে না। আর আমি আমার বসের সামনে বসে সমানে তর্ক করতে পারি, নিজের মতামত ব্যক্ত করতে পারি। এ চাকরির যদি কোন সুখ থাকে তা এই বাক-স্বাধীনতায়। শয়ন ভোজনের স্বাচ্ছন্দ্যে নয়।

মিঃ দত্তগুপ্ত আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন বোধ হয়, অন্য যুগের দূরত্ব থেকে আর এক যুগকে বুঝবার চেষ্টা করলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'দেখ, ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। এটা আমার কালের তোমার কালের ভেদ বিভেদের কথা নয়। এটা হল

ব্যক্তিগত টেম্পারামেণ্টের ব্যাপার। আমার কালেও তোমার মত বস্তুবাদী কিছু কম ছিল নাকি? আমার বন্ধুদের মধ্যে কঠোর বস্তুবাদী এখনো ঢের আছে। তারা মেয়েদের মাংসের ডেলা ছাড়া আর কিছু বলে জানে না।'

আমি বললাম, 'সেও প্রকৃত জানা নয়, বিকৃত করে জানা। আমাদের মধ্যেও মেদ মাংস ছাড়া যেমন অতিরিক্ত কিছু আছে, মেয়েদের মধ্যেও তাই।'

আমার কথা দত্তগুপ্ত মশাইর কানে গেল কিনা জানি না, তিনি নিজের মনেই বলতে লাগলেন, 'কালের ব্যাপার নয়, টেম্পারামেণ্টের ব্যাপার। কেউ নারীকে এক গুচ্ছ গোলাপ ফুলের মত দেখতে ভালোবাসে তার কানে কানে কবিতা আওড়াতে ভালোবাসে, কেউ বা চর্বির রস বানিয়েই তাকে উপভোগ করে। এ শুধু ব্যক্তিত্বের ভেদ, পদ্ধতি প্রকরণের ভেদ, কালের ভেদ নয়।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কী যেন ভাবতে লাগলেন প্রিয়গোপাল। তারপর বললেন, 'তুমি যতই বল না, আমাদের বাসনা, আমাদের প্যাশন চোখে চশমা পরিয়ে দেবেই। কারো চোখে কালো চশমা, কারো চোখে রঙিন চশমা। কারো চোখে নীল পীত লোহিত। আমরা শুধু যা আছে তাই দেখতেই ভালোবাসি না, যা নেই তা দেখতে আর দেখাতেও ভালোবাসি। একে বলতে পার অপর বাস্তব কি পরা বাস্তব। আমি এই দ্বিতীয় বাস্তবের ভক্ত। আমি সেই ডন কুইকসট। যে প্রস্টিটিউটকেও প্রিনসেস বলে জ্ঞান করে, বারবার ঘা খেলেও যার ভ্রম যায় না।'

নানা প্রসঙ্গ নিয়েই প্রিয়গোপালবাবু আমার সঙ্গে আলোচনা করেন। তার মধ্যে মেয়েদের কথাও থাকে। কোন না কোন ভাবে তিনি মেয়ের প্রসঙ্গ টেনে আনেন। আশ্চর্য এই বয়সেও ওঁর মধ্যে একটা চাপা প্যাশন আছে, তা ওঁর কথায় বার্তায় ফুটে ওঠে। অবশ্য সেই প্যাশন শুধু এখন বাক্যের মধ্যেই আবদ্ধ। অন্য কোন ভাবে তার স্ফুরণ বড় একটা দেখি না। তবে এখনো কাব্য আর উপন্যাস পাঠে তাঁর আসক্তি আছে। গান শোনেন, ছবির এক্‌জিবিশনও মাঝে মাঝে দেখতে যান। কিন্তু পাশের ফ্লাটে রুনু বউদিদের যে মেয়ে মজলিস বসে সেখানে তিনি একদিনও যান না। নিমন্ত্রিত

হলেও কোন না কোন ছলে তা এড়িয়ে যান।

আমি একদিন বলেছিলাম, 'এ কি কাণ্ড আপনার। আপনি যান না কেন? রুনু বউদিরা কিন্তু আপনাকে **expect** করেন। আপনার কথা ওঁদের আমি প্রায়ই বলি।'

প্রিয়গোপাল হেসে বলেন, '**So kind of you,** গিয়ে কি করব বল। আমার চুল পেকে গেছে গাল ভেঙ্গে গেছে গায়ের চামড়া কুঁচকে গেছে। নিজের মুখ আমি আয়নায় দেখি আর কৃপণ হিংসুটে প্রকৃতিকে বারবার অভিশাপ দিই। ওগো দত্তাপ-হারিণী, এ তোমার দানের কী রকম ধরন। তুমি যদি কেড়েই নেবে তবে দিয়েছিলে কেন? আমি একবার জবাব পাই আমার ছেলেদের দিকে চেয়ে। তাদের মধ্যে আমার যৌবন দ্বিগুণ হয়ে ফিরে এসেছে। কিন্তু এই বোধ বেশীক্ষণ থাকে না। আমার ছেলেদের সঙ্গে আমার যে আইডেনটিফিকেশন তা ক্ষণিকের, সর্বক্ষণের নয়। তারাও সব সময় বুঝিয়ে দেয়। তারা আলাদা, আলাদা, আলাদা। ভিন্ন দেহ, ভিন্ন রুচি, ভিন্ন মন। একেবারে ভিন্ন এনটিটি। মাঝে মাঝে মনে হয় তারা যে আমার আত্মজ এ শুধু আমার কল্পনা মাত্র। তাই আমি নিজের ছেলেদের ছেড়ে দিয়ে একটি পরের ছেলেকে ধরেছি। যে আমার বেতনভুক কর্মচারী, যে আমার ওপর নির্ভরশীল। যে আমাকে মানতে বাধ্য। কিন্তু আশ্চর্য, সেও দেখছি আমার পুরোপুরি বশংবদ নয়। সেও তর্ক করে। মাঝে মাঝে ঘাড় ফুলিয়ে দাঁড়ায়। সেও দেখছি একখানি ছিটে কণ্ঠ।'

আমি হেসে বলি, 'আপনি কি রকমের বাধ্যতা চান? সব সময় আমাকে যো হুকুম হয়ে থাকতে হবে? জল কাৎ বললে ঘাড় কাৎ করে বলতে হবে আজ্ঞে হ্যাঁ, জল কাৎ হয়েই আছে?'

তিনি বললেন, 'তা কেন? আমি এমন একজনকে চাই যার সঙ্গে আমি অভিন্ন হতে পারব। আমি চাই একজন সর্বৈবানুমতঃ সুহৃদকে, আমি চাই একজন সমপ্রাণ সখা কে। আর একজন ব্যক্তির সঙ্গে সে নারী হোক, পুরুষ হোক, বালক হোক, যুবক হোক তার সঙ্গে পরিপূর্ণ ঐক্যের স্বাদ আমি পেতে চাই। কিন্তু মেলে না। কারো সঙ্গেই আমার তেমন করে মেলে না।'

আমি বললাম, 'আপনার নিজের সঙ্গেই কি মেলে?'

তিনি একটু অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালেন, 'এ কথা তুমি কি করে জানলে দীপক, এই স্ববিরোধের কথা তুমি কোথায় শুনলে? নিশ্চয়ই বইটইতে পড়েছ। ভ্রাতৃবিরোধ, পুত্রবিরোধ, বন্ধুবিরোধ, সব বিরোধের চেয়ে বড় বিরোধ হল এই স্ববিরোধ। এ মামলার শেষ নেই। কোন সুপ্রীম কোর্টেই এ মামলার যোগ্য বিচার হয় না।'

ভদ্রলোক যে ইনটারেসটিং তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে ওঁর সঙ্গ উপভোগ করতে হলে একটু ধৈর্য চাই। প্রথম প্রথম ওঁর এই হল না হল না, পেলাম না পেলাম না ভাবের মানে বোঝা আমার পক্ষে শক্ত হত। সাততলার ফ্লাটে এত বড় বড় তিনখানা ঘরের মালিক, মোটা টাকা পেনশন পান, শুনেছি সিঁথি অঞ্চলে আরো একখানা বাড়ি আছে। সেখান থেকেও ভাড়া আসে। ছেলেরা কাছে থাকেন না। একজন দিল্লীতে, আর একজন মাদ্রাজে আর একজন নিউ-ইয়র্কে। সবাই মোটা মাইনের চাকুরে! যে যার স্ত্রীপুত্র নিয়ে আলাদা সংসার পেতেছেন। কিন্তু ছেলেদের নাম খুব কমই মুখে আনেন মিঃ দত্তগুপ্ত। মনে হয় না খুব একটা বিচ্ছেদ যন্ত্রণা তাঁর মধ্যে আছে। তিনি নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। কী যে চান কিসের যে তাঁর অভাব, কী তিনি পাননি আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। আমার মাঝে মাঝে মনে হয় অভাবটা আসলে তাঁর বিলাস। কিন্তু আমার অভাব ঐ ধরনের কাল্পনিক অভাব নয়। আমি আপাততঃ একটি ভদ্রগোছের চাকরি চাই। মাইনেটা মোটা না হলেও মোটামুটি ভালো হবে। উন্নতির আশা থাকবে আর যে কাজ করে আমি নিজে তৃপ্তি পাব। আর সেই কাজের কথাটা সবাইকে মুখ উঁচু করে বলতে পারব। কিন্তু কোথায় সেই কাজ। কোথায় আমার সেই যোগ্যতা প্রমাণের কর্মক্ষেত্র?

প্রিয়গোপালবাবু অবশ্য মাঝে মাঝে বলেন, 'অত খুঁতখুঁত কোরো না দীপক। হাতের কাছে যা পেয়েছ তা ভোগ করো। জীবন যখন তোমাকে যা দিচ্ছে তাই দু হাত পেতে নাও। এর পর আর পাবে না। প্রকৃতি বড় নিষ্ঠুর। একবার সে ফিরে গেলে দ্বিতীয়বার আর সে তোমার দিকে ফিরে তাকাবে না।'

জীবনকে ভোগ করা মানে কি? ভোগ মানে কি যৌন সম্ভোগ?

বৃদ্ধের কথা শুনে আমার তাই মাঝে মাঝে মনে হয়। ওঁর নিজের সেই সম্ভোগ ক্ষমতা নেই। মেয়েরা ওঁর দিকে আর ফিরেও তাকায় না। প্রাকৃতিক নিয়মে তিনি যেমন জরাগ্রস্ত তরুণীরা তেমনি তাঁর প্রতি বিমুখ। তিনি নিজেও তা জানেন। কিন্তু সব সময় সে কথা মনে রাখতে পারেন না। তাই তিনি যৌবনকে যৌন সম্ভোগের সঙ্গে একাত্ম করে দেখেন। যৌবনের যেন আর কোন কাজ নেই, আর কোন বাসনা কামনা নেই আর কোন ঊর্ধ্বলোকে সে যেন আরোহণের চেষ্টা করে না! আমার মনে হয় প্রিয়গোপালবাবুও নিজের যৌবনের কথা ভুলে গেছেন। সেই যৌবন নিশ্চয়ই শুধু নারীসঙ্গ কামনা করত না, নারীসঙ্গে তৃপ্ত থাকত না। সে বিদ্যা চাইত, বিত্ত চাইত, প্রতিপত্তি চাইত। এই অর্থেই সে ছিল বহু-কামী। বার্ধক্যে মানুষ স্মৃতিভ্রংশ হয়। নিজের যৌবনকে প্রিয়গোপাল ভুলে গেছেন। ভুলে গেছেন যৌবনের মহিমা।

অবশ্য শুধু এই বৃদ্ধ প্রিয়গোপালই নয় আমার পরিচিত যুবকবন্ধুদের মধ্যেও অনেককে দেখেছি যৌবন মানেই যেন তাদের কাছে সুরা আর নারীর সম্ভোগ। তারা রাতের পর রাত পার্ক স্ট্রীটের রেস্টুরেণ্টগুলিতে পড়ে থাকে। যার নিজের টাকা আছে সে দু হাতে ওড়ায়, যার নেই সে বড়লোক বন্ধুর ঘাড়ে ভর করে। দলে পড়ে আমিও দু'একদিন ওইসব আস্তানায় গিয়েছি। ওদের কীর্তিকলাপ দেখেছি। মত্ত জড়িত কণ্ঠে নানারকমের ইনটেলেক-চুয়াল আলোচনাও শুনেছি। কিন্তু ওই ধরনের ডিসিপেশন আমাকে কখনোই আকৃষ্ট করেনি। ওরা আমাকে ঠাট্টা করেছে। 'আসলে তুই বুড়ো। কাঁচা বয়সের খোলস পরা প্রপিতামহ!'

প্রপিতামহ।

আমি হেসে বলেছি, 'বোধহয় তাই হবে।'

কিন্তু পানভোজন নারীসঙ্গই যদি যৌবনের একমাত্র অনুষঙ্গ হবে, তাহলে ওইসব বারে আর বারবিলাসিনীদের কাছে মাঝ-বয়সীদেরই বা অত ভিড় কেন? আমি বলি যথার্থ যৌবন অন্যভাবে পরিস্ফুট। জ্ঞানে কর্মে বিদ্রোহে আবার সংগঠনী উদ্ভাবনী প্রতিভায়। ওরা বলে, 'তুই সেকেলে, একেবারে সেকেলে। জাত মাস্টার।'

কিন্তু মাস্টারদের নামে রক্ষণশীলতার দোষ দেওয়া বৃথা। একালের বহু স্কুল আর কলেজের মাস্টারকেও দেখেছি। তাঁরা ওঁদের দলই ভারী করে তুলেছেন। তাঁদের বক্তব্য, 'আমরা ছেলে পড়াই বলে কি সবদিক থেকে উপোস করে থাকব নাকি ?'

কিন্তু আমার ছেলেবেলা আর কৈশোর কেটেছে যথার্থ একজন জাতমাস্টারের সঙ্গে। তিনি ছিলেন আমার ছোট মামা। স্কুলেই মাস্টারি করতেন। কিন্তু অনেক কলেজের প্রফেসরের চেয়েও তাঁর বিদ্যা বেশী ছিল। ছাত্রেরা তাঁকে ভালোবাসত, তাঁর সহকর্মীরা তাঁকে ভালোবাসতেন। তিনিও তাঁদের ভালোবাসতেন। কিন্তু সবচেয়ে ভালোবাসতেন বই। চল্লিশ পূর্ণ হবার আগেই তিনি মারা গেছেন। বিয়ে থা করেননি। তাই নিয়ে দিদিমার মনে খুব দুঃখ ছিল। আমার সেই মামাকেও তাঁর বয়সের লোকেরা রক্ষণশীল বলত। তাঁর জীবনেও মদ মেয়ে কি অন্য ধরনের কোন বিলাস ব্যসনের প্রয়োজন হয়নি। শুধু জ্ঞানেই যেন তাঁর অন্য সব আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হয়েছে। আমার এই ছোট মামা বড় বড় কথা বলতেন না, নিজের বিদ্যাবুদ্ধি নিয়ে বড়াই করতেন না। বাড়িতে কি বাড়ির বাইরে কাউকে কোন কড়া কথা বলতে শুনিনি। তবু আমার অন্য মামারা তাঁকে এক ধরনের ভয় করতেন। মামাত ভাইরাও সমীহ করে চলতেন। তাঁর সামনে কোন বাচালতা কোন প্রগলভতা তাঁদের ছিল না।

আমার এই মামাকে আমি গোপনে গোপনে খুব ভালোবাসতাম। মনে মনে ভাবতাম আমি ছোট মামার মত হব।

তা অবশ্য হতে পারিনি। তাঁর মত জ্ঞানের অমন অদম্যস্পৃহা আমার নেই। এই তো প্রিয়গোপালবাবুর এত বড় লাইব্রেরী রয়েছে। কিন্তু আমি কখনা বই পড়ি? তিনিও খুব বেশী পড়েন কিনা আমার সন্দেহ আছে। ঘর ভরতি বই সাজিয়ে রেখে তিনি বলেন 'Books are poor substitutes for life. আমি চাই নিরক্ষর হতে, বন্যমানুষের মত জীবন কাটাতে! Raw tea, raw tobbaco, and raw life. গাছপালা, ফুল ফল মাটি পাথর জন্তু জানোয়ার আর নারী পুরুষের টগবগে দৈহিক যৌবন। যৌবন সুরা। বইয়ের কোন দরকার নেই। প্রকৃতিই আমার কাছে একটি

মাত্র গ্রন্থ, মহাগ্রন্থ। আমার সেই গ্রন্থের আমিই লেখক, আমিই পাঠক।'

কিন্তু সবই বৃদ্ধের মৌখিক আস্ফালন। ঘুরে ফিরে আবার তিনি বইয়ের আশ্রয় নেন। তাঁর প্রকৃতি পরিচয় কয়েকটি টবের ফুলগাছের মধ্যেই আবদ্ধ। জন্তু জানোয়ারের জগৎ থেকে তিনি বহুদূরে। একটি কুকুরও তিনি পোষেন না, বিড়াল দেখলে দূর দূর করেন। পোকামাকড় দেখলে মেয়েদের মতই ভয়ে আঁতকে ওঠেন। ভারী ইনটারেস্টিং ভারী মজার মানুষ এই বুড়ো প্রিয়গোপালবাবু। শুধু হাতে একটু সময় চাই, মনে খানিকটা প্রশান্তি চাই, তাহলে ওঁকে দেখেও সময় কাটানো যায়। উনি প্রকৃতি পাঠ করেন কিনা জানি না, কিন্তু আমি ওঁর চালচলন আচার-ব্যবহার বসে বসে দেখি, আর মনে মনে হাসি।

যে প্রত্যক্ষ জৈবজীবনকে আর কোনদিন ছুঁতেও পারবেন না প্রিয়গোপাল সেই জীবনকে দুহাতে বুকে আকড়ে ধরবার জন্যে যেন তাঁর আকাঙ্ক্ষার সীমা নেই।

তিনি আবৃত্তি করেন 'ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি
অবনী বহিয়া যায়।'

তারপর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'আমার কি ইচ্ছা করে জানো দীপক? সেই লাবণ্য রস আমি দুহাতে আঁজলা ভরে পান করি, সারা গায়ে মাখি।'

আমি হেসে বলি, 'মাখুন না।'

তিনি মাথা নাড়েন, 'উহু, তার আর উপায় নেই। তাহলে কায়কল্প করাতে হয়। নব কলেবর ধারণ করতে হয়। পুরু তার বাবাকে একশ বছরের জন্যে নিজের যৌবন ধার দিয়েছিল। আমার ছেলেরা এক দিনের জন্যেও দিল না। তারা এত অকৃতজ্ঞ।'

আমি হেসে বলি, 'সে কি, একদিনের জন্যেও না।'

বৃদ্ধ মাথা নেড়ে বলেন, 'না, তারা আমাকে বুঝতেই দেয়নি তাদের যৌবন আমারও যৌবন। তাদের সম্পদ আমারও সম্পদ। যতদিন কাছে ছিল তারা শুধু আমার সঙ্গে ঝগড়া করেছে। মহৎ কোন নৈতিক কি রাজনৈতিক আদর্শ নিয়ে কলহ নয়, নিতান্তই তুচ্ছ ছোট ছোট ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া। তারা যেন পণ করেছিল

তোমাকে আমরা মানব না, স্বীকার করব না। তুমি আমাদের জন্যে কিচ্ছু করনি, আমরা নিজেরাই নিজেদের ইচ্ছায় জন্মেছি, নিজেদের চেষ্টায় বড় হয়েছি, লেখাপড়া শিখেছি, চাকরি বাকরি পেয়েছি। আমরা স্বয়ম্ভূ, স্বকল্পিত স্বগঠিত স্বপ্রতিষ্ঠ স্বনামধন্য। তারাও বলে আমি আমি আমি, আমিও বলি আমি আমি আমি। স্ব স্ব করতে করতে করতে মনের দিক থেকে আমরা নিঃস্ব হয়ে গেলাম। তারপর তারাও বিয়ে থা করল, তাদের ছেলেমেয়ে হল। তারা যে যার স্বতন্ত্র রাজ্যের অধিপতি। তারাও স্বৈরতন্ত্রী। সেই রাষ্ট্রের সঙ্গে আমার রাষ্ট্রের যোগাযোগ যৎকিঞ্চিৎ। প্রায়ই যুদ্ধকালীন অবস্থা বর্তমান, ক্বচিৎ কখনো সাময়িক সন্ধি। সীমান্তে দুপক্ষেরই লক্ষ লক্ষ সৈন্য।'

কথা বলতে ভালোবাসেন প্রিয়গোপালবাবু। অত্যুক্তি তাঁর প্রধান অলংকার। একবার শুরু করলে আর থামতে চান না। তবে তাঁর শুধু বাক্‌বাহুল্যই নেই, বাক্‌বিভূতিও আছে। কথা তিনি বলতে পারেন। ভঙ্গিতে একটু ব্যঙ্গতা নাটকীয়তা আছে। একটু অভ্যস্ত হয়ে গেলে সেই ম্যানারিজমকে মনোহর বলেই মনে হয়।

সেদিন আমাকে প্রিয়গোপালবাবু বলেছিলেন, 'ধার দেবে তুমি আমাকে তোমার যৌবন? একশ বছরের জন্যে নয়, গলিত নখদন্ত নিয়ে শতায়ু হয়ে কী করব। একবছরই যথেষ্ট। বর্ষভোগ্য যৌবন তুমি আমাকে দেবে যুবক?'

আমি হেসে বলি, 'নিন না। এক বছর কেন আপনি জীবনস্বত্ব হিসাবেই নিন না। কিন্তু আপনার কি মনে আছে একশ বছর ছেলের যৌবন ভোগ করার পর যযাতি কী বলেছিলেন।'

প্রিয়গোপাল বলেন, 'আছে বইকি।

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি

হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়ঃ এবাভি বর্ধতে।

কিন্তু যযাতির এই বৈরাগ্য দ্বিতীয় বার শত বছর ধরা করা যৌবন সম্ভোগের পর। তৃতীয়বার যদি কেউ তাঁকে অফার করত তিনি তা হাত পেতে নিতেন। ভোগ করতেন আবার বৈরাগ্যের বাণী উচ্চারণও করতেন। আমাদের মনে ভোগী আর বৈরাগী

পাশাপাশি বাস করে। তারা দীর্ঘকালের স্বামী-স্ত্রীর মত পরস্পরকে ভালোও বাসে আবার ঝগড়াও করে। বাইরের লোক বুঝতে পারে না, কোন্‌টা তাদের ঝগড়া কোনটাই বা তাদের ভালোবাসা। আচ্ছা, দীপক তুমি তো তোমার যৌবন আমাকে ধার দিলে, সুদ কী নেবে?'

হেসে বলি, 'সুদ আপনাকে কিছু দিতে হবে না।'

প্রিয়গোপাল বললেন, 'তাই কি হয়? আমি তোমাকে আমার সম্পত্তির কিছু অংশ লিখে দেব। বাকীটা দেব কোন ফিলানথ্রোপিক অর্গানিজেশনে। আমার ছেলেরা নাকি আমার কাছ থেকে কিছু নেবে না।'

আমি বললাম, 'তাহলে আপনি সবই জনকল্যাণে দিন। আপনার সম্পত্তির অংশ নিয়ে কী হবে। শেষে মামলা মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়ব। তার চেয়ে আপনি আমাকে ভালো করে একখানা সুপারিশ চিঠি লিখে দিন। যাতে কোন অফিসে আমার একটা কাজ জোটে। সরকারী হোক আধা সরকারী হোক বেসরকারী হোক হলেই হল।'

প্রিয়গোপাল হেসে নাটকীয় ভঙ্গিতে বললেন, 'হায় যুবক, আমি তোমাকে ইন্দ্রের ঐশ্বর্য দিতে চাইলাম, আর তুমি বললে একটি চাকরি ছাড়া আর কিছু চাইনে। আমি তোমাকে সোনার খনির সন্ধান দিলাম আর তুমি বললে আমাকে এক মুঠি খুদ শুধু ভিক্ষে দিন, সেই আমার সোনামুঠি। কিন্তু যুবক আমার ঐরাবত তোমাকে শুঁড়ে করে তুলে নিয়ে রাজসিংহাসনে বসিয়ে দিতে পারে, কিন্তু খুদ কুঁড়োর জোগান দিতে পারে না। আজ আমার সুপারিশ চিঠির কোন দাম নেই। যতদিন জজিয়তি ছিল ততদিন আমার দাম ছিল। আজ আমি আর ফাঁসির আসামী একই পর্যায়ের। দুজনেই সেলে আবদ্ধ। দুজনেরই মৃত্যুদণ্ড হয়ে গেছে। এখন বসে বসে শুধু প্রহর গোনা। শেষ মুহূর্তের প্রতীক্ষা।'

অতটাই কি খারাপ অবস্থা হয়েছে প্রিয়গোপালবাবুর? আমার তো তা মনে হয় না। আমার ধারণা তিনি ইচ্ছা করেই আমাকে চাকরির ব্যাপারে কোন রকম সাহায্য করেন না। পাছে আমি তাঁর হাতছাড়া হয়ে যাই। একশ টাকায় আমার মত এমন সহিষ্ণু শ্রোতা

কোথায় পাবেন ? যে চব্বিশ ঘণ্টা ওঁর বাক্‌ যন্ত্রের বকরবকর শব্দ শুনবে। ওঁর যে অতীত জীবন সম্বন্ধে শ্রোতার কোন রকম কোন উৎসাহ নেই কৌতূহল নেই লক্ষ টাকার বিনিময়েও কি তা বসে বসে কেউ শুনবে ? প্রিয়গোপাল জানেন কেউ তা শুনবে না। তিনি জানেন কেউ তাঁকে আর ভালোবাসবে না। ভালোবাসার ভান পর্যন্ত করবে না। ওঁর ছেলেমেয়েরা ওঁর কাছ থেকে দূরে সরে গেছে, ওঁর স্ত্রী পর্যন্ত ওঁকে এড়িয়ে চলেন, সামাজিকতার নামে অন্য পরিবারের লোকজনের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আসেন। এই বয়সে ওঁর বন্ধু নেই বান্ধব নেই। একটা মাছি পর্যত ওঁর কাছে এসে বসে না। নিজে ছড়া প্রিয়গোপালের আর কেউ প্রিয় আছে কিনা আমার সন্দেহ। অথচ আশ্চর্য নিজেকে নিয়ে থাকতে তাঁর ভয়। একা একা থাকতে তিনিও যেন চান না, কি থাকতে পারেন না। তাই অন্যের সঙ্গ খোঁজেন। সেই সঙ্গ অর্থের বিনিময়ে ভরণপোষণের বিনিময়ে কখনো তোষণের বিনিময়ে তিনি সেই সঙ্গসুখ চান। তিনি কোন তরুণী মেয়েকে যে এই কাজে রাখেননি ভালোই করেছেন। সে এক সপ্তাহের বেশী ওঁর কাছে টিকতে পারত না। আমার কাছে প্রিয়গোপাল যেমন যৌবন ভিক্ষা করেন তার কাছেও তাই করতেন। সে ভিক্ষার অর্থ অন্যরকম দাঁড়াত। তরুণী হয় ভয় পেয়ে ছুটে পালাত, আর বীরাঙ্গনা হলে চাকরির তোয়াক্কা না রেখে বুড়োর ওই তোবড়ানো গালে চড় বসিয়ে দিত।

ছোট মামার কথা আবার মনে পড়ে। তিনি কিন্তু নিজেকে নিয়ে পরিতৃপ্ত ছিলেন। তাঁকে কখনো বই পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে পড়তে দেখিনি। তিনিও ইনট্রোভার্ট ছিলেন। কিন্তু নিজের ঘর কখনো তাঁর কাছে কারাগার হয়ে ওঠেনি। আমার মনে হয় তিনি পরহিতব্রতী হলেও খুব একটা অন্তরঙ্গতা তাঁরও কারো সঙ্গে ছিল না। মনে মনে তিনিও নিঃসঙ্গ ছিলেন। কিন্তু সেই নিঃসঙ্গতা নিয়ে তিনি আক্ষেপ করতেন না। তা মোচনের চেষ্টাও করতেন না। সেই নিঃসঙ্গতাকে তিনি নিজের স্বভাবধর্ম বলেই গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তা উপভোগ করতেন। জানি না প্রিয়-গোপালবাবুর মত এত বেশী বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকলে তাঁর কী অবস্থা হত। কিন্তু তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন তাঁর মত করে

জীবনকে তিনি ভোগও করেছেন। আমার ধারণা ভোগ শুধু রসে নয়, জ্ঞানে যে আনন্দ সেও এক পরম সম্ভোগ। আমরা এমনভাবে জ্ঞান আর রসের কথা বলি যেন এই দুই বস্তু আলাদা আলাদা ওয়াটার টাইট কম্পার্টমেণ্টে গুদামজাত। আসলে কি তাই? স্বাদ গ্রহণের সময় কোন এক রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সব এক হয়ে যায়। তখন জ্ঞানও যা রসও তাই। বিজ্ঞানীরা দার্শনিকরা যে লোকে বাস করেন সেও রসলোক, রাসলীলার সঙ্গে তার যত বৈসাদৃশ্যই থাকুক। আমার ছোট মামার মতামত মোটামুটি এই রকমই ছিল।

তিনি আত্মপ্রশংসায় যেমন বিমুখ ছিলেন, আত্মনিন্দাও তাঁর মুখে তেমনি শুনিনি। তিনি নিজেকে নিজে খণ্ডন করতেন না। তিনি বড় কিছু ছিলেন না, কিন্তু ছোট একখণ্ড মণিরত্নের মত এক অখণ্ড সত্তার অধিকারী ছিলেন। মানুষের খণ্ডিত চূর্ণিত বিচূর্ণিত যে সত্তা তাকে আমরা গল্পে উপন্যাসে উপভোগ করি কিন্তু বাস্তব জীবনে তাকে সহ্য করি না। সামঞ্জস্যপূর্ণ অখণ্ডতা সামগ্রিকতাই আমাদের আদর্শ। আমাদের মূল বাসনার রাজধানী। আমরা যে পাহাড়ে জঙ্গলে মৃগয়ায় বেরোই সে শুধু আমাদের দুচারদিনের শখ মাত্র।

কিন্তু আমার বন্ধুরা এই ধরনের কথায় সায় দেয় না। তারা বলে, 'তোমার মতামত দেড়শ বছর আগেকার। মোটেই একালের নয়।'

আমি বলি, 'তোমরা যা বলছ তাই বা কী এমন নতুন। তা সেকালেও ছিল এ কালেও আছে। শুধু ভঙ্গিটা পালটেছে।'

আমার ছোটমামার কথা আমি প্রিয়গোপালবাবুকে বলেছি।

বুড়ো বয়সেও প্রিয়গোপালবাবু অনেকটা সিনিকের মত কথাবার্তা বলেন। মানুষের সততা ভদ্রতা উদারতাকে যেন নিঃসংশয়ে গ্রহণ করতে পারেন না। কিন্তু ছোট মামার কথা তিনি বেশ মন দিয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনেছেন। তারপর ধীরে ধীরে বলেছেন, 'তিনি নমস্য ব্যক্তি। নরানাং মাতুলক্রমঃ। তুমি বোধহয় তোমার ছোট মামার মতই হবে।'

কেউ কি অবিকল কারো মত হয়? নাকি চাইলেই হতে পারে?

আমি জানি আমি ছোট মামার মত হতে পারব না। ঠিক পুরোপুরি তার প্রোটোটাইপ হওয়া আমার ইচ্ছাও নয়। তিনি সংসারে থেকেও যোগীর মত বাস করতেন। আমি তা করতে চাই না। এই পৃথিবীর রূপ রস গন্ধ স্পর্শের মাঝে আমি ঘনিষ্ঠ সংযোগ রাখতে চাই। আমার বৃদ্ধ মনিব প্রিয়গোপালবাবু, কি আমার সমবয়সী যুবক বন্ধুদের মত ভোগকেই আমি সর্বস্ব বলে মনে করিনে কিন্তু ভোগ সম্ভোগকে আমার তালিকা থেকে বাদ দিতে চাইনে।

ছোট মামার ওপর প্রিয়গোপালবাবুর শ্রদ্ধাটুকু আমার খুব ভালো লাগে। আমি নিজেও সেই শ্রদ্ধার অংশীদার।

৩

আমার পৃথিবীটা এখন এই পাশাপাশি দুটি ফ্লাটের মধ্যে আবদ্ধ। একটি ফ্লাটে সস্ত্রীক প্রিয়গোপালবাবু আর আমি। আর পাশের ফ্লাট রুনু বউদিদের। একটি আমার কাজের জায়গা আর একটি বেড়াবার, অবসর কাটাবার। পৃথিবী অনেক বড় এমন কি এই কলকাতা শহরও আমার পক্ষে একটি ছোটখাটো পৃথিবী বললেই চলে। কিন্তু এই কসমোপলিটান শহরে আমি বাস করি এইমাত্র। তাই বলে নিজেকে কি বিশ্বনাগরিক বলতে পারি? এই শহরের এক অতি ক্ষুদ্র অংশে আমার বাস। এখানকার কজন অবাঙ্গালীর সঙ্গেই বা আমার পরিচয় আছে। যেটুকু পরিচয় তাও নিতান্তই মৌখিক। সুযোগই হয় না, কোন উপলক্ষ্যই ঘটে না তার চেয়ে বেশি করে চেনবার জানবার। আমি ছোট শহরে থাকি না, বড় শহরে বাস করি, ইচ্ছা করলে এখানকার যে কোন সুযোগ সুবিধা আমি গ্রহণ করতে পারি, এখানকার রাজনৈতিক সামাজিক জীবনে অংশ নিতে পারি, এখানকার বিচিত্র বিপুল ঘটনাস্রোত আমাকে নিত্য নতুন বিস্ময়ের বস্তু উপহার দিতে পারে। কিন্তু দেয় কি? কলকাতা শহর তো দূরের কথা এই যে পঞ্চান্নটা ফ্লাটের পাম স্টেট, এগার তলার উত্তুঙ্গ সৌধ, এরই বা কটা ফ্লাটের কজন মানুষকে আমি চিনি? কজনের সঙ্গে আমার আলাপ আছে? এই ছোটখাটো একটি উপনগরের উপ উপ উপ নাগরিকও আমি নই। বুড়ো

প্রিয়গোপালের মত আমি শুধু যে ঘরখানার মধ্যে থাকি সেই ঘরেরই বাসিন্দা।

দুপুরের কয়েক ঘণ্টা কোন কোন দিন এসপ্লানেড ডালহৌসির অফিস অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে বেড়াই। কিন্তু এই বৃথা ভ্রমণে আর বৃথা চেষ্টায় মাঝে মাঝে ক্লান্তি আসে। নৈরাশ্য আরো বেড়ে যায়। যেদিকেই তাকাই নিষেধের দেয়াল খাড়া হয়ে রয়েছে। সবাই যেন বলছে 'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।' সেই যে অন্য কোন বাঞ্ছিত স্থান যেখানে আমি আমার পছন্দমত কাজ পাব, সে কোথায়? আমি তার ঠিকানা জানি না। কোন দিনই কি খুঁজে পাব?

হতাশ হয়ে আবার আমি আমার ঘরের কোণে আশ্রয় নিই। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি দরকার নেই আমার উন্নতির চেষ্টায়। বেশ আছি। আমার বুড়ো মনিব প্রিয়গোপালের নিত্যসহচর হয়ে আর রুনু বউদির সঙ্গে গল্পসল্প ফষ্টিনষ্টি করে যদি আমার বাকী জীবনটা কেটে যায়, যাক, এর থেকে মোটা মাইনে না-হোক, সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় উপযোগী কোনরূপ আর আমি খুঁজব না; গভীরতর তাৎপর্যপূর্ণ কোন সম্পর্কে আমি আবদ্ধ হতে চাইব না। আমাকেই যদি কেউ না চায়, আমার বিদ্যাবুদ্ধি শক্তি সামর্থ্য যদি এই সমাজ কাজে লাগাতে না চায় আমারই বা কী এমন দায় পড়েছে মাথায় ঝাঁকা নিয়ে গলিতে গলিতে ফিরি করে বেড়ানো, 'চাই কাঁসা পেতল, কাঁসা পেতল।' আমি জানি আমার ঝাঁকায় যা আছে তার সবই কাঁসা পেতল নয়। সোনাদানাও কিছু কিছু রয়েছে। কিন্তু কে সেই জহুরী যে সব চিনে নেবে? যারা চাকরিবাকরি পেয়ে সমাজে সংসারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাদের সবাইয়ের যোগ্যতাই যে আমার চেয়ে বেশী তা আমি স্বীকার করি না। আমার বন্ধু সুহাস সেদিন বলেছিল, 'আসলে তোর মধ্যে সেলসম্যানসিপের অভাব। তোর যা আছে তা পাঁচজনকে তো জানাতে হবে। নিজের ঢাক নিজে না পেটালে কে তোর ঢাক বয়ে বেড়াবে বল তো?'

সুহাস অবশ্য ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করেছে, আধা মাড়োয়ারী আধা ইওরোপীয়ান একটি ফার্মে চাকরিও পেয়েছে। ওর ব্যবহারিক যোগ্যতা আমার চেয়ে অনেক বেশী। ও আমার মত সাধারণ

গ্রাজুয়েট নয়। জার্নালিজম পড়তে পড়তে বীতস্পৃহ হয়ে পড়া ছেড়েও দেয়নি।

আমার চেয়ে অযোগ্য লোক যেমন দিব্যি করে কর্মে খাচ্ছে আবার আমার চেয়ে যোগ্যতর লোকও তেমনি কোন কাজ পাচ্ছে না। তাদের সংখ্যা শতশত হাজার হাজার। আমার চেনাশুনার মধ্যেও এমন ছেলের সংখ্যা কম নয়। আজকাল মেয়েরাও আছে। সম্প্রতি ওই যে মিসেস হালদারের বোন শম্পা এসেছে সেও তো চাকরি প্রার্থিনী। তার আত্মীয়স্বজনরা বর খুঁজছে কিন্তু বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে সে একটি চাকরিও চায়। শুনেছি সমীরণবাবুর কাছে সেও একটি লিখিত আবেদন দিয়ে রেখেছে। ছোট প্রতি-যোগিতার ক্ষেত্রে সেও আমার প্রতিদ্বন্দ্বিনী। সমীরণবাবুর অফিসে মেয়ের সংখ্যাই বেশী। বেশী কেন মেয়েরাই সব। আর্টিস্টের কাজ তারাই করে। দারোয়ান বেয়ারা অ্যাকাউণ্টেণ্ট কাম ক্যাশিয়ার, একজন হলেন কপি লেখক আর মালিক ও সর্বাধ্যক্ষ সমীরণবাবু নিজেই শুধু সেখানে পুরুষ। ম্যাডান স্ট্রীটের একটি সরু গলির মধ্যে চারতলার একটি ফ্লাটে সমীরণবাবুর সেই ভেনাস পাবলি-সিটির অফিস। আমি একদিন গিয়ে দেখে এসেছি। কিন্তু এ অফিসেও কাজ খালি নেই। সবগুলি চেয়ারই ভরতি। আহা, আমার জন্যে একখানি বাড়তি চেয়ার এখানে পাতা যায় না, সমীরণ-বাবুর সামনের গদি আঁটা সম্মানিত অথিতির চেয়ারে বসে দামি সুস্বাদু চা খেতে খেতে আমি সেদিন ভেবেছিলাম, পরে অবশ্য এই কাঙালপনার জন্যে লজ্জিতও হয়েছিলাম।

শুনেছি ওই অফিসে কাজ হওয়ার কিছু সম্ভাবনা আছে। একটি মেয়ের নাকি বিয়ের কথাবার্তা পাকা হয়েছে। সে চাকরি ছেড়ে দেবে। তার চেয়ারে গিয়ে যদি শম্পা বসতে পারে। শম্পা অবশ্য তুলি ধরতে জানে না। কিন্তু ভালো আলপনা দিতে পারে, সেলাই আর এমব্রয়ডারির কাজ জানে। সমীরণবাবু বলেছেন—'আর্টিস্টিক টেস্ট থাকলেই হল। তোমাকে শিখিয়ে পড়িয়ে নেওয়া যাবে।'

অল্প মাইনের শিক্ষানবীসদের দিকেই শুনেছি সমীরণবাবুর আগ্রহ বেশী। পুরো মাইনের যোগ্য হতে হতে তাদের হয় বিয়ে

হয়ে যায়, না হয় তারা অন্যত্র কাজকর্ম যোগাড় করে নেয়।

আমার আজেবাজে ভাবনার ঘূর্ণিপাক হঠাৎ থামল। আজও রুনু বউদির দূতী শ্যামলী এসে হাজির হয়েছে, 'বউদি আপনাকে ডাকছেন।'

কিন্তু আজ আর ওর ঠোঁটে পরিহাসের সেই হাসিটুকু নেই। ওর মুখ শুকনো। শঙ্কায় ভয়ে, ওর কালো মুখখানা যেন আরো অন্ধকার দেখাচ্ছে।

বললাম, 'কী ব্যাপার। আজ আবার রুনু বউদির ক্লাবের বৈঠক বসেছে নাকি? বউঠাকুরানীর হাট?'

শ্যামলী বলল, 'না ও সব কিছু নয়, আপনাকে অন্য দরকারে ডেকেছেন, জরুরী দরকার।'

একটু অবাক হলাম। ভাবলাম আমি তো ওঁদের অদরকারের মানুষ। আমাকে দিয়ে কী এমন কাজ থাকতে পারে।

গেঞ্জি গায়ে ছিল, জামাটা না চড়িয়েই আজ রুনু বউদির ফ্লাটে চলে গেলাম। দেখি, শ্যামলী ভিতরে গিয়ে ঢুকেছে। রুনু বউদি অপরিচিত দুজন ভদ্রলোক—ভদ্রলোক তাদের ঠিক বলা চলে না—কারখানার মজুর শ্রেণীর লোক তাদের সঙ্গে কথা বলছেন।

রুনু বউদি আমাকে দেখে বললেন, 'এই যে দীপক। এরা কী বলছেন শোন।'

তারপর রোগা লম্বা লোকটিকে দেখিয়ে বললেন, 'ইনি বলছেন—ইনি নাকি শ্যামলীর স্বামী।'

লোকটি বলল, 'নাকি বলছেন কেন বউদি? সিমি এখানে বুঝি শ্যামলী হয়েছে নাম—সিমিকে জিজ্ঞেস করে দেখুন না। বৈরাগী বোষ্টমের কণ্ঠিবদল নয়। পুরুত ডেকে শালগ্রাম সাক্ষী রেখে আমাদের বিয়ে হয়েছিল। আমাদের একটি বাচ্চাও আছে। চার বছর তার বয়স। সিমির মার কাছে সে মানুষ হচ্ছে। ডাকুন সিমিকে—বলুক সে বাচ্চা আমার নয়। কি সেই ছেলেকে ও পেটে ধরেনি? বলুক এসে। ভগবানের নামে দিব্যি করে সে কথা ও যদি বলতে পারে আমি সব স্বত্ব ছেড়ে দিতে রাজি আছি।'

আমি বললাম, 'আপনি একটু ভদ্রভাবে কথা বলুন। কী নাম আপনার?'

লোকটি বলল, 'আজ্ঞে আমার নাম বিজয় মণ্ডল। আমি তো কোন খারাপ কাজ করিনি, বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে গা ঢাকা দিয়ে থাকিনি যে নাম ভাড়াব? মশাইয়ের নামটি জানতে পারি? আপনিই কি আজকাল শ্যামলীর মনিব?'

বিজয়ের কথার মধ্যে একটু বাঁকা শ্লেষ ছিল। আমি সেটুকু লক্ষ্য করে রূঢ় স্বরেই বললাম, 'না। শ্যামলীর যিনি মনিব তিনি এখন অফিসে আছেন। দরকার হলে আমরা তাঁকে এক্ষুণি ফোন করে দেব। ভদ্রলোকের বাড়িতে এসে অনর্থক ঝামেলা করবার অধিকার আপনার নেই।'

বিজয়ের পাশে যে লোকটি বসেছিল তার রঙ ফর্সা। একটু মোটোসোটা চেহারা। বিজয়ের চেয়ে বয়সে কিছু বড়ই হবে। পানের রসে তার ঠোঁট লাল, মুখে হাসি। সে কথা বলে আস্তে আস্তে। তার কথার ধরন শুনে মনে হল সে বিজয়ের চেয়ে স্থিরবুদ্ধির মানুষ।

সে বলল, 'বিজয় মাথা গরম কোরো না। মাথা গরম করবার সময় এখন তোমার নয়, জায়গাও এটা নয়।'

তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওকেই বা কি দোষ দেব বলুন। নিজের পরিবার যখন ঘর ছেড়ে চলে এসেছে তার কি দেহে কান্তি থাকে না মনে শান্তি থাকে?'

বিজয়ের দেহে যে কান্তি নেই তা ওকে দেখলেই বোঝা যায়। মুখে দু তিন দিনের খোঁচা খোঁচা দাড়ি জমেছে। জামা কাপড় আধময়লা। চুলগুলো উসকোখুসকো, চোখ দুটো লালচে। নেশাটেশা করে বলেই মনে হয়।

বিজয় রুনু বউদির দিকে তাকিয়ে বলল। 'বউদি আপনি শুনেছেন সব ব্যাপার?'

রুনু বউদি বললেন, 'শুনেছি। কাজ নেওয়ার সময় শ্যামলী আমার কাছে সব খুলেই বলেছিল।'

বিজয় আবার উত্তেজিত হয়ে উঠল, 'খুলে বলেছিল? সব জেনেশুনে আপনি ওকে জায়গা দিলেন? নিশ্চয়ই সব সত্যি কথা বলেনি। আর আমি বর্তমান থাকতে মাগী যে সব শাঁখা সিঁদুর ত্যাগ করে কন্যাকুমারী সাজল এই বা কি রকম ব্যাভার

বলুন তো ?'

আমি আপত্তি জানিয়ে বললাম, 'এখানে একজন ভদ্রমহিলা রয়েছেন। আপনি ভদ্রভাষায় কথা বলবেন।'

রুনু বউদি বললেন, 'ও যখন প্রথম আমার কাছে আসে সিঁথিতে একটু করে সিঁদুর ছোঁয়াত। তারপর আমিই একদিন বললাম তোমাদের যখন ছাড়াছাড়িই হয়ে গেছে ওসব সিঁদুর টিঁদুরের কী দরকার। সিঁদুর থাকলেই লোকের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হয়, স্বামী কোথায় ? কেন একসঙ্গে বসবাস করে না ? এই সব নানা প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে প্রাণ যায়। তার চেয়ে তুলে ফেলাই ভালো।'

বিজয় একটু দুঃখের সঙ্গে বলল, 'হিন্দুর মেয়ে হয়ে আপনিই এই ব্যবস্থাটা দিলেন বউদি ? একবার ভেবে দেখলেন না কী অমঙ্গল কী সর্বনাশই না হতে পারত। যে কোনদিন আমি মরে যেতে পারতাম।'

এ কথায় আমার হাসি পেল, রুনু বউদিও হাসলেন। বললেন, 'বালাই আপনি মরবেন কেন। আপনার অক্ষয় পরমায়ু হোক। সিঁদুর কেউ পরে কেউ পরে না। তাতে মানুষের আয়ুর কমতি হয় না। এখন যখন জানলাম আপনাদের সম্পর্ক আছে, একেবারে ছাড়াছাড়ি হয়নি, ফের পরবে না হয় সিঁদুর।'

বিজয় বলল, 'ছাড়াছাড়ি ! ছাড়াছাড়ি হওয়া কি অতই সোজা বউদি ? ছাড়ো বললেই কি আর ঘরের পরিবারকে কেউ ছেড়ে দেয় ?'

রুনু বউদি বললেন, 'তা তো ঠিকই। কিন্তু শ্যামলী আমাকে বলেছে আপনি ওর ওপর অনেক অত্যাচার করেছেন। সেই জন্যেই ওর আর শ্বশুরবাড়িতে যাওয়ার ইচ্ছা নেই।'

কেশব এবার হাসল, 'বউদি এও কি একটা কথা হল ? আপনিও তো মেয়েমানুষ। মেয়েমানুষের কিসে সুখ তা কি আর আপনি জানেন না ? স্বামীর সংসারে সে যদি শাক ভাত খেয়েও থাকে তাতেও তার সুখ। এখানে ওর খাওয়া পরার অভাব নেই। কিন্তু মেয়েমানুষের আরো পাঁচটা সাধ আহ্লাদ যে আছে বউদি। ভগবানের আশীর্বাদে একটি ছেলে হয়েছে। তারও তো ভবিষ্যৎ

দেখতে হবে। সে ছেলে কি চিরকাল মামাবাড়িতে থেকেই মানুষ হবে? আপনি ওকে একটু বুঝিয়ে বলুন না বউদি।'

রুনু বউদি বললেন, 'আমার বলায় তো কিছু হবে না। আপনারা যদি ওকে বুঝিয়ে সুজিয়ে নিয়ে যেতে পারেন নিয়ে যান, আমার আপত্তি কি। দুটো দিন আমার একটু কষ্ট হবে। তারপর কাজের লোক আমি খুঁজে পাবই।'

বিজয় বলল, 'তা আর পাবেন না কেন বউদি। ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় নাকি? একটা কেন দুটো লোক আমি আপনাকে এনে দেব। ওকে আপনি ছেড়ে দিন।'

রুনু বউদি অসহিষ্ণু হয়ে বললেন, 'কী আশ্চর্য। আমি ওকে বেঁধে রেখেছি? ও যদি যায় আপনারা যান না নিয়ে।'

বিজয় বলল, 'তাহলে ওর সঙ্গে আমাকে একবার কথা বলতে দিন।'

রুনু বউদি বললেন, 'নিশ্চয়ই। যান না। ওই তো ওই ঘরের দোরের আড়ালে ও দাঁড়িয়ে রয়েছে। আপনি কথা বলে আসুন।'

কেশব বলল, 'কথা যে বলবে বিজয় বুঝে শুনে বলবে। গোঁয়া-র্তুমি করে কোন লাভ হবে না। তেমন পাত্রীই তোমার বউ নয়।'

বিজয় বলল, 'তাহলে তুমিই যাওনা কেশবদা। মিছরির গুঁড়ো রাখা গলায় তুমি কথা বলতে পার। আমার তো অত সব আসে না। আমি স্পষ্টবক্তা মানুষ। মনে যা আসে সাফ বলে দিই।'

কেশব হেসে বলল, 'সবসময় কি অমন চাঁছাছোলা জিবে কাজ হয় রে ভাই?'

স্ত্রীকে বোঝাবার জন্যে বিজয় সামনের ছোট ঘরটায় গিয়ে ঢুকল। দরজাটা ভেজিয়ে দিল। কিন্তু জানালা দুটো খোলাই রইল।

প্রথম কিছুক্ষণ বিজয়ের নরম গলা শোনা গেল। মনে হয় অনুনয় বিনয় কাকুতি মিনতি করছে। কিন্তু খানিক পরেই ওর গলা চড়ে উঠল, 'তুই যাবি কিনা বল। যদি না যাস আমি থানা পুলিস করব। আইন আদালতের সাহায্য নেব। পুলিস এসে কোমরে দড়ি বেঁধে তোকে টানতে টানতে নিয়ে যাবে।'

শ্যামলী জবাব দিল, 'বেশ তাই কেন এসে নেয়।'

বিজয় বলল, 'তখন দেখবি মজা। তুই যাবিনে, তোর ঘাড়ে যাবে।'

আমি এবার কথা না বলে পারলাম না, 'অমন তুই তুই করছেন কেন? এটা ভদ্রলোকের বাড়ি।'

কেশব হেসে বলল, 'কিছু মনে করবেন না। ওটা আমাদের মুখের লব্জ। আমরা পরিবারকে শুধু রাগ করেই তুই তোকারি করি নে, আদর করেও তুই বলি।'

আমার মনে পড়ল কলেজে ইউনিভার্সিটিতেও ছেলেমেয়েরা পরস্পরকে আজকাল তুই বলে। কিন্তু সে তুই-এর উচ্চারণ আর ব্যঞ্জনা আলাদা। দুটি ছেলে মেয়েকে আমি জানি তারা তুই বলতে বলতে বিয়ে করল। এখন আবার তুমি বলে।

মীমাংসা কিছুই হল না। কেশবই আলাদাভাবে শ্যামলীকে গিয়ে বুঝিয়ে এল। কিন্তু শ্যামলীকে রাজি করাতে পারল না। কোন প্রলোভনই তাকে আকৃষ্ট করল না। স্বামী-সুখই যে মেয়েদের একমাত্র না হোক প্রধান সুখ, এনন অকাট্য যুক্তিও শ্যামলী অগ্রাহ্য করল। বিজয় আরো একদফা শাসায়। থানা পুলিস করব আইন আদালত করব। কিন্তু মনে হল না শ্যামলী তাতেও ভয় পেয়েছে। বিজয় কাকুতি মিনতি করতেও বাকী রাখল না।

বন্ধ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল, 'সিমি তুই আমার চেয়ে বয়সে দশ বছরের ছোট আমি বড়। আমি তোর পায়ে ধরে ক্ষমা চাইছি। যা হয়ে গেছে তার তো আর চারা নেই। ক্ষমা কর। ভুলে যা! আয় আমরা আগের মত ঘর সংসার করি।'

বিজয়ের এই দীনতায় আমার নিজেরই লজ্জা করতে লাগল। ওর ওই দর্প আস্ফালন বরং সহ্য করা যায় কিন্তু স্ত্রীর কাছে পুরুষের এই বশ্যতা এই আত্মবিলুপ্তি যেন চোখে দেখা যায় না কানেও শোনা যায় না।

শ্যামলী দোরের আড়ালে অচল অটল হয়ে রইল। সে বাইরে এসে ঝগড়াও করল না ভবিষ্যতের কোন প্রতিশ্রুতিও দিল না। ওর এই কঠোরতায় একটু অবাক হলাম বই কি। হাসিখুশী ভরা এই মেয়েটিকে এতদিন যা দেখেছি তাতে ওকে নরম প্রকৃতির বলেই তো মনে হয়েছিল।

যাওয়ার সময় বিজয় বলে গেল শ্যামলী যেন নিজের ভবিষ্যৎ ভালো করে ভেবে দেখে। নিজেদের গ্রামে বিজয়রাও গণ্যমান্য মানুষ। তাদের বাড়ির কোন বউ চৌদ্দপুরুষেও অন্যের বাড়িতে ঝিগিরি করেনি। নিজের জাত বংশের মান ডুবিয়েছে শ্যামলী। এমন কেউ করে? এতে কি তার নিজেরই ভালো হবে? আর পেটে যে ছেলেটা হয়েছে তার অবস্থা কী হবে তা কি ভেবে দেখেছে শ্যামলী? সেই ছেলে কি সমাজে দশজনের সামনে মুখ উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে? বিজয় বলে গেল এক সপ্তাহ বাদে সে আবার আসবে। শ্যামলী যেন নিজের পরিণামের কথা চিন্তা করে কাজ করে।

কেশব আর বিজয় চলে যাবার পর আমরা কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। যেন একটা ঝড় বয়ে গেছে। অমন যে কৌতুকময়ী রুনু বউদি তাঁর মুখখানাও ক্ষোভে আর বিরক্তিতে থমথম করছে।

একটু বাদে আমি হেসে বললাম, 'কী কাণ্ড হয়ে গেল বউদি। যাকে কন্যাকুমারী বলে জানতাম আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের মত তার আঁচলের তলা থেকে জলজ্যান্ত গোঁয়ারগোবিন্দ এক স্বামী বেরোল, একটি ছেলেও নাকি আছে। পয়লা নম্বরের ভানুমতী কিন্তু আপনি। আর দোসরা নম্বর ওই শ্যামলী। দিনের পর দিন কী করে আপনারা এমন ভেলকি খেলছিলেন বলুন তো?'

রুনু বউদি এবার তাঁর ফর্মে এলেন। হেসে বললেন, 'ভেলকি আর দেখাতে পারলাম কই। হাতে নাতে ধরা তো পড়ে গেলাম। ধরা পড়লাম ওই শ্যামলীরই দোষে। ওই আমাকে বলেছিল স্বামীর সঙ্গে ওর আর কোন সম্পর্ক নেই। সে আর একটা বিয়ে করেছে। ছেলেকে ও মায়ের কাছে রেখে নিজের ভাত কাপড়ের ব্যবস্থা ও নিজে করবে বলে বেরিয়েছে! এসব শুনে আমি ওকে বলেছিলাম সব যখন চুকে-বুকেই গেছে সধবার সাজটা আর কেন রাখিস। ওতে নানাজনের কাছে নানারকম কৈফিয়ৎ দিতে হয়। কুমারী হলে আর সে বালাই থাকে না! এখন দেখ দেখি কী ঝামেলা। উনি এসে শুনলে নিশ্চয়ই খুব বকাবকি করবেন।'

বললাম, 'ওঁকে না শোনালেই হবে। শ্যামলীর ফাইলটা আপনার গোপন দফতরে রেখে দিন না।'

রুনু বউদি বললেন, 'আমাদের গোপনতা বলে কিছু নেই। আমরা কেউ কাউকে কিছু লুকোই না। আর দারুণ বিশ্বাস করি। নইলে ওই একগাদা মেয়ের মধ্যে তোমার সমীরণদাকে আমি ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারতাম ?'

হেসে বললাম, 'একগাদা মেয়ের মধ্যে হয়তো ছেড়ে দেওয়া যায়। কিন্তু একজনের সঙ্গে ছেড়ে দেওয়া বড় শক্ত।'

রুনু বউদিও হাসলেন, 'তুমি কী করে বুঝলে ? এখনো নাক টিপলে দুধ বেরোয়। যাই বলো, শ্যামলীর ব্যাপারটা বড় বিশ্রী হয়ে গেল। আমি যেমন বাড়িঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে ভালোবাসি তোমার সমীরণদা তেমনি ফাইল ক্লিয়ার রাখতে চান। সে নিজেদেরই হোক, আত্মীয়স্বজনেরই হোক আর ঝি চাকরেরই হোক। কোন জটিলতা, কোন ঝক্কি ঝামেলা পছন্দ করেন না। কিন্তু সংসার কি সেইরকম হয় ? বিশেষ করে ঝি চাকরদের মধ্যে ? অনিয়ম অনাচার ওদের তো কিছু কিছু থাকবেই।'

আমি সায় দিয়ে বললাম, 'ঠিক বলেছেন বউদি। ওরা যে অবস্থার মধ্যে থাকে, যে ভাবে বসবাস করে—'

রুনু বউদি বললেন, 'একবার হয়েছিল কি। অল্পবয়সী একটি ঝি এসেছিল আমাদের বাড়িতে। তার নাম ছিল মল্লিকা। তারও স্বামীর সঙ্গে বনিবনাও ছিল না। পরে শোনা গেল সে নাকি কিছু-দিন আগেও খারাপ পাড়ায় ঘর নিয়েছিল। তোমার সমীরণদা একমাসের মাইনে বেশী দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তাকে ছাড়িয়ে দিলেন। আমি বললাম এই পৌষ মাসে কুকুর বিড়ালও লোকে বাড়ি থেকে বিদায় করে না। আর তুমি একটা অসহায় মেয়েকে ছাড়িয়ে দিতে চাও! আমি কত কষ্ট করে মেয়েটাকে রান্নাবান্না শিখিয়েছি, চালচলন আদবকায়দায় তৈরি করে নিয়েছি—। কিন্তু কাকে বলা। তিনি হাইজিনের কথা তুললেন, বাড়ির শুচিতা পবিত্রতা রক্ষার কথা বললেন। শেষ পর্যন্ত মেয়েটাকে বিদায় করে তবে ছাড়লেন।'

আমি বললাম, 'এসব ব্যাপারে সমীরণদা তো খুব কড়া দেখছি।'

রুনু বউদি বললেন, 'আমার বাবার মত কিন্তু আলাদা। তিনি সেকেলে বুড়ো মানুষ। কিন্তু যথেষ্ট সহ্যগুণ। তিনি

বলেন ওরা যে সব জায়গা থেকে এসেছে তাতে ওদের ছেলেরা চুরি করবে, মেয়েরা খারাপ বৃত্তি নেবে এই তো স্বাভাবিক। রাগ করলে চলবে কেন। ওদের শুধরে নিতে হবে। এই উদারতার জন্যে বাবার অনেক ক্ষতি হয়েছে। তবু আমাদের বাড়ি থেকে সহজে লোকজন ছাড়ানো হয় না।

শ্যামলীর ঘটনায় কেন যেন সহানুভূতির চেয়ে আমার মনে কৌতুক বোধটাই বড় হয়ে উঠল। ওর স্বামী বিজয় যে ভাবে হম্বিতম্বি করে গেল তাতে হয়তো কৌতুক রসের উপাদানই বেশী ছিল। না-কি যেহেতু ওরা আমার সমশ্রেণীর মানুষ নয় তাই ওদের জীবনের জটিলতা, ওদের সমস্যাসংকুলতা, ওদের দুঃখ-বেদনা ঘাত-প্রতিঘাত আমরা সেইভাবে বুঝতে পারি না। আমরা শুধু ওদের দারিদ্র্য-দুঃখই বুঝতে পারি। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যেন শুধু আমাদের শিক্ষিত ভদ্র সমাজের মধ্যেই আছে।

মাঝে মাঝে মনে হয় আমরা কেউ কারো দুঃখ পুরোপুরি বুঝতে পারি না। শুধু খানিকটা অনুমান করতে পারি। এই যে বুড়ো প্রিয়গোপালবাবু আমার এত কাছের মানুষ, আজকাল বেশির ভাগ সময় তো ওঁর সঙ্গেই আমার কাটে। তিন ঘন ঘন আমার সঙ্গে তাঁর আইডেনটিটি কার্ড বদল করেন। তবু তিনিই বা আমার সমস্যার কথা, আমার আশা-নৈরাশ্যের কথা কতটুকু বুঝতে পারেন আর আমিই বা ওঁর দুঃখ ক্ষোভ, কামনা-বাসনার অপূর্ণতার কথা কতটুকু অনুভব করতে পারি? যিনি আয়ুর প্রায় শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছেন, যিনি জীবনে দিয়েছেন প্রচুর, পেয়েছেন প্রচুর, তাঁরাও যে কিসের অপ্রাপ্তির দুঃখ আমি কি তা বুঝতে পারি? আমার সহানুভূতি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। অনেকের সম্বন্ধেই আমি উদাসীন। তাদের সুখ-দুঃখ আমাকে স্পর্শ করে না। তাদের থাকা না থাকা আমার কাছে সমমূল্য। আমিও ঠিক তাদের কাছে তেমনি। পথের পাশে পড়ে থাকা একটি ইটের টুকরোর চেয়ে আমারই বা কজনের কাছে কতটুকু দাম আছে?

দু'তিনদিনের মধ্যে শ্যামলী আমাদের ফ্লাটে এল না। রুনু বউদির মহিলা বৈঠকে আমার আর ডাক পড়ল না। তিনি শ্যামলীকে না পাঠালেও শ্যামলী মাঝে মাঝে আসে। সময় থাকলে

মিসেস দত্তগুপ্তের সঙ্গে একটু গল্প করে যায়। দু একখানা হাতের কাজও যে না করে তা নয়। নিজের ব্যবহারে শ্যামলী সকলের প্রিয় হয়ে উঠেছে। প্রিয়গোপালও ওকে ডেকে দু-একটা কথাটথা বলেন।

ওকে না দেখে প্রিয়গোপালও একবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী ব্যাপার? মেয়েটার কী হল?'

মিসেস দত্তগুপ্ত বললেন, 'ও নাকি ঘর থেকে বেরোচ্ছে না। কেঁদে কেঁদে চোখ মুখ ফুলিয়েছে।'

প্রিয়গোপালবাবু বললেন, 'কেন কাঁদছে কেন?'

তাঁর স্ত্রী বললেন, 'কী হবে তোমার সে কথা শুনে? তুমি কি সবাইয়ের কান্না ঘুচাতে পার?'

'চেষ্টা তো করতে পারি।'

মিসেস দত্তগুপ্ত বললেন, 'তুমি যে কত বড় দয়ালু তা আমার জানা আছে। মানুষের দুঃখকষ্টের কথা শুনলেই তা দূর করবার জন্যে ছুটে যাবে তুমি সেইরকম পাত্রই কিনা। কারো দুঃখকষ্টের কথা শুনলে তুমি তা নিয়ে গবেষণা করবে, বন্ধুবান্ধব কেউ এলে তাঁদের সঙ্গে সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করবে, তর্ক-বিতর্কও হবে কিন্তু তার বেশী কিছু করা তোমার ধাতে নেই।'

প্রিয়গোপাল আমাকে সাক্ষী মানলেন, 'জানো দীপক আমার স্ত্রীর ধারণা তাঁর মত করুণাময়ী হৃদয়বতী আর দুনিয়ায় নেই আর আমার মত হৃদয়হীনও একান্ত দুর্লভ। ফলে আমাদের একটি রাজযোটক হয়েছে।'

প্রিয়গোপালের কিছু ব্যক্তিগত দানধ্যান আছে তা আমি জানি। আমার সন্দেহ হয় সব কথা তাঁর স্ত্রী জানেন না। আবার প্রাইভেট সেক্রেটারিরও অজ্ঞাত কিছু কিছু প্রাইভেট ব্যাপার প্রিয়গোপালের আছে বলে আমার ধারণা। যাই হোক বৃদ্ধ দম্পতিকে বাক্য ও অর্থের মত পরস্পরের সঙ্গে সম্পৃক্ত পার্বতী পরমেশ্বর বলে কিছুতেই আমার মনে হয় না। এরা যেন মূর্তিমান বাদ প্রতিবাদ। একজন যা বলেন আর একজন সঙ্গে সঙ্গে তার উলটো কথাটি উচ্চারণ করেন। পরস্পরের প্রশংসা ওঁদের মুখে খুব কমই শোনা যায়। এ যে কেবল লোক দেখান ব্যাজস্তুতি তা আমার মনে

হয় না। এই দুটি নারী পুরুষ পরস্পরের গুণপনার তারিফ না করে পরস্পরের মর্যাদা স্বীকার না করে সারা জীবন একসঙ্গে কাটিয়ে গেলেন। পাশাপাশি আর একটি দম্পতির কথা আমার মনে পড়ল। বিজয় আর শ্যামলী। ওদের ভিতরের মন এতই প্রবল এতই তীব্র যে একসঙ্গে বাস করা ওদের পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছে না।

কিন্তু বিজয় তো স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে এসেছিল। এত সাধাসাধি এত অনুনয় বিনয়। শ্যামলী গেল না কেন? আর নাই যদি যাবে তবে এত কান্নাকাটিই বা কিসের? আমি ভাবলাম মেয়েদের চালচলন আচার আচরণের মধ্যে যুক্তি খুঁজে পাওয়া ভার। সে শিক্ষিতাই হোক আর অশিক্ষিতাই হোক।

মিসেস দত্তগুপ্ত খানকয়েক চিঠি আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'তুমি কি বাইরে যাবে দীপক? আমার চিঠিগুলি বাক্সে ফেলে দিয়ে যেয়ো।'

ছেলেমেয়ে জামাতা পুত্রবধূদের সঙ্গে যোগাযোগ মিসেস দত্তগুপ্তেরই বেশী। দূরে থাকলেও চিঠিপত্রে তিনি বেশ ঘনিষ্ঠ সংযোগ রেখেছেন। প্রিয়গোপালবাবুও চিঠিপত্র লেখেন। বেশীর ভাগই কাজের চিঠি। অকাজের চিঠি যা লেখেন তা পুরোন বন্ধুদের কাছে। তাঁদের মধ্যে দুচারজন বান্ধবীও আছেন। সে সব চিঠি অবশ্য তিনি ডিকটেশনে লেখান না। নিজের হাতেই লেখেন। তাঁর হাতের লেখা আমার কাছে দুর্বোধ্য লাগে। কিন্তু যাঁদের কাছে তিনি লেখেন তাঁদের বুঝতে নিশ্চয়ই অসুবিধা হয় না।

মিসেস দত্তগুপ্ত বললেন, 'লেটার বক্সটা তো সামনেই আছে?'

আমি হেসে বললাম, 'হ্যাঁ অনেক লেখালেখির পর পোস্টাল ডিপার্টমেন্টের কাছ থেকে আমরা একটি বড়সর লেটার বক্স আদায় করতে পেরেছি। বেড়ার গায়ে ঝোলানো ইঁদুর মারা বাক্সের মত নয় মাটিতে পোঁতা দাঁড় করানো বড় বাক্স। ভালো লাগে না আপনার দেখতে?'

মিসেম দত্তগুপ্ত বললেন, 'লাগে না আবার? গণেশ ঠাকুরের মত টুকটুকে রং। ভারী সুন্দর হয়েছে জিনিসটা। দেখলেই ইচ্ছা

হয় চিঠি ফেলে দিই। আমি বুড়ো মানুষ আমারই যদি এই অবস্থা হয়, কমবয়সী ছেলেমেয়েদের কী অবস্থা বুঝতেই পারো। আমাদের শম্পাও খুব চিঠি লেখে।'

মিসেস দত্তগুপ্ত আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন : 'ওকে চেন না ?'

বললাম, 'চিনি। রুনু বউদিদের ক্লাবে আলাপ হয়েছিল।'

মিসেস দত্তগুপ্ত বললেন, 'বেশ মেয়েটি। চেহারায় লক্ষ্মীশ্রী আছে। স্বভাবটিও খুব ভালো। অথচ যারা সেদিন এসে দেখে গেল তাদের নাকি তেমন পছন্দ হয়নি।'

বললাম, 'কেন ?'

'তারা নাকি আরো সুন্দরী চায়। কী যে রুচি আমি তো বুঝিনে বাপু। মেয়ে দেখতে এলেই ডানাকাটা পরী চাইতে হবে ?'

মিসেস দত্তগুপ্ত অন্তত আট দশটি ফ্লাটের খবর রাখেন। শুধু খবর রেখেই ক্ষান্ত হন না, এইসব ফ্লাটের বাসিন্দাদের সুখদুঃখের ভাগ নেন। কোনরকম সমস্যা দেখা দিলে তা সমাধানের চেষ্টা করেন। বড় রকমের জটিল গ্রন্থিমোচন হয়তো করে উঠতে পারেন না কিন্তু ছোট ছোট গিঁট বাঁধার কাজে ওঁর উৎসাহের অন্ত নেই। আগে এই এগারতলার ফ্লাট বাড়িটায় কোন লিফট ছিল না। তা সত্ত্বেও তিনি ওই ভারী শরীর নিয়ে দিব্যি ওঠা-নামা করতেন। এখন লিফট হওয়ায় খুব সুবিধা হয়েছে। ছোট্ট মেয়ের মতন ঘন ঘন ওঠেন নামেন। রুনু বউদিদের ক্লাবের উনি অবিসংবাদিত প্রেসিডেণ্ট।

লিফটে ওঠানামা করতে করতে রুদ্ধদ্বার ফ্লাটগুলি আমারও চোখে পড়ে। মনে হয় এক একটি ফ্লাট যেন এক একটি দ্বীপ। চারদিকে অনিচ্ছা, ঔদাসীন্য অনাত্মীয়তার নীলাম্বুরাশি। পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন। স্বয়ংসম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপরাজ্য। মিসেস দত্তগুপ্ত যেন এই সমুদ্রে একটি মেইল স্টীমার। যোগাযোগের ভাসমান সেতু।

শ্যামলীর খবরও তিনি রাখেন দেখলাম।

তিনি সেদিন আমাকে ডেকে বললেন, 'মেয়েটার সম্বন্ধে রুনু

কী ঠিক করল ?'

আমি বুঝতে পেরেও জিজ্ঞাসা করলাম, 'কার কথা বলছেন ?'

তিনি বললেন, 'ওই যে তোমাদের শ্যামলী। কী হল ওর ? স্বামীর ঘরে চলে যাওয়াই তো ভালো।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'আপনি জানেন সব ?'

মিসেস দত্তগুপ্ত বললেন, 'তোমার অনেক—অনেক আগে জানি। শ্যামলী আমাকে নিজেই সব বলেছে।'

আমি বললাম, 'আপনাকে কেউ কিছু না বলে পারে ? আপনি বোধহয় মানুষের পেটের কথা টেনে বার করতে পারেন।'

তিনি হেসে বললেন, 'কেবল তোমার কথাই কিছু শুনতে পারলাম না দীপক। তুমি বড্ড চাপা।'

বললাম, 'আমার তেমন কোন কথা থাকলে তো বলবো ?'

তিনি একটু দুঃখের সঙ্গে বললেন, 'তুমি কেমন যেন পরপর ভাব আমাদের। নিজেদের ছেলেমেয়েরা কেউ কাছে থাকে না। সারা বাড়িটা খাঁ-খাঁ করে। এমন একা একা থাকতে ভালো লাগে তাই বলো ? তাই তো আরো পাঁচটি সংসারের সঙ্গে যতদূর পারি নিজেকে জড়িয়ে রাখি। অন্যের বাচ্চাগুলিকে কোলে কাঁখে করে ঘুরে বেড়াই।'

সে কথা ঠিক। বিশেষ করে রুনু বউদির দুটি ছেলেমেয়ে বাবলু আর বুলার খুব আবদার মেটান তিনি। তারাও দিদা অন্ত প্রাণ। কিন্তু মিঃ দত্তগুপ্তের ধারেকাছেও তারা যায় না। তাঁকে তারা শুধু ভয়ই করে না অপছন্দও করে।

মিসেস দত্তগুপ্ত বললেন, 'কেন অমন পরপর মনে কর আমাদের ? কেন দূরে দূরে থাকো ? ওভাবে থাকলে কি শান্তি পাওয়া যায় ? যেখানে থাকবে মিলে মিশে থাকবে। একদিন তুমি এখান থেকে চলে যাবে, তোমার নিজের ঘর-সংসার হবে। যদি বেঁচে থাকি, তোমার সেই সংসার গিয়ে দেখেও আসব। কিন্তু এখানে যতদিন আছ আমাদের আপনজন বলে ভেব। আমরাও যেন তোমাকে আপন বলে ভাবতে পারি !'

আমি চুপ করে রইলাম। ভদ্রমহিলার কথা বলার ভঙ্গির মধ্যে কিসের একটা যেন জাদু আছে। তা স্বাভাবিকভাবেই মনকে

টানে। শুধু কথাই নয়। নিজের হাতে তিনি আমাকে খাবার এনে দেন। সামনে বসে খাওয়ান। কম খেলে বকেন। শোয়ার আগেও একবার খোঁজ নিয়ে যান আমি ঘুমোলাম কিনা। আমার অবশ্য সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়বার অভ্যাস নেই। রাত একটা দেড়টার আগে আমার ঘুম পায় না। মিসেস দত্তগুপ্ত আমাকে রোজই শাসন করে যান। 'শরীর খারাপ করবে দীপক শুয়ে পড়ো, এবার শুয়ে পড়ো। বই তো, আর পালিয়ে যাচ্ছে না। দিনেও পড়তে পারবে।'

সব সময় তাঁর অনুরোধ রাখতে পারি না। কিন্তু এই সস্নেহ শাসনটুকু ভাল লাগে।

মিঃ দত্তগুপ্ত কিন্তু ওঁর তুলনায় দারুণ ফর্মাল। তিনি যত একাত্মতার কথাই বলুন মনে হয় অনেক দূর থেকে এবং আমাকে অনেক দূরে রেখে কথা বলছেন। কথাবার্তায় তিনি বইয়ের ভাষাই পছন্দ করেন এবং নাটকীয় ভঙ্গি। ফলে একটু আধটু কৃত্রিমতার সুর তাঁর কণ্ঠে জড়িয়ে থাকে। কে জানে এটা তাঁর ইচ্ছাকৃত কিনা।

শুতে যাওয়ার আগে তিনিও আমাকে ইংরেজী কায়দায় হ্যাণ্ড-শেক করে গুড-নাইট জানান। কিন্তু তাঁর এই শুভেচ্ছাজ্ঞাপন-টুকুও যেন পরিহাসের মোড়কে মোড়া।

চাল-চলনে আদব-কায়দায় স্বামী-স্ত্রী সম্পূর্ণ আলাদা। তবু আশ্চর্য মিঃ দত্তগুপ্তকে আমার ভালো লাগে। মনে হয় ওঁর নিঃসঙ্গতার সঙ্গে, নৈরাশ্যবোধের সঙ্গে, মানসিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত, অন্ত-র্বিরোধের সঙ্গে কোথায় যেন অতি দূর সম্পর্কের একটু আত্মীয়তা আছে।

শ্যামলীর ব্যাপার সব জেনেশুনেও মিসেস দত্তগুপ্ত কেন যে বললেন, স্বামীর কাছেই ওর ফিরে যাওয়া উচিত আমি তা বুঝতে পারলাম না। হয়তো পুরোন সংস্কার থেকেই এরূপ বলেছেন তিনি। সন্তানবতী স্ত্রীর স্বামীর ঘর ছাড়া আর জায়গা নেই, সেখানে যত অসম্মানই তার হোক, শারীরিক, মানসিক যত কষ্টই সে সহ্য করুক তাকে সর্বংসহা হয়ে থাকতে হবে। মিসেস দত্ত-গুপ্তের বিশ্বাস এই সহ্যশক্তির পরিণাম শেষ পর্যন্ত ভালো হয়।

কিন্তু রুনু বউদির কাছে আমি যা শুনলাম, শ্যামলী নিজেও আমাকে যা বলল তাতে মনে হল ওর ফিরে গিয়ে বিশেষ কোন লাভ হবে না।

লোকটি স্যাডিস্ট ধরনের। আর কাউকে নির্যাতন করতে পারুক আর না পারুক বউকে মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দিয়ে বিজয় খুব আনন্দ পায়। আর তাতে ও পৌরুষের গর্বও বোধ করে। গাঁজা খায়, মদ খায় বিজয়, খারাপ ধরনের স্ত্রীলোকের সঙ্গে সম্পর্কও রাখে কিন্তু তাতেও নাকি শ্যামলীর বিশেষ আপত্তি ছিল না যদি অমন নিষ্ঠুরভাবে না মারত। শুধু প্রাণের ভয়েই শ্যামলী স্বামীর ঘর থেকে চলে এসেছে। মান-সম্মানের দিকে তাকায়নি। প্রাণের চেয়ে সত্যিই তো কিছু আর বড় নয়।

স্বামীর হাতের মারের দাগ, পিঠে গরম চিমটের পোড়া দাগ, গলায় পাঁচ আঙ্গুলের দাগও নাকি রুনু বউদিকে শ্যামলী দেখিয়েছে। শুনিয়েছে এই সব নিদারুণ নিষ্ঠুরতার কাহিনী।

রুনু বউদি জিজ্ঞাসা করেছেন, 'সব সত্যি বলছিস তুই?'

শ্যামলী জবাব দিয়েছে, 'এক বর্ণও মিথ্যে বলিনি বউদি। আমার ছেলে আছে, ছেলের দিব্যি দিয়ে বলছি, এমন অত্যাচার মানুষ সহ্য করতে পারে না।'

'কিন্তু কেন সে তোর ওপর এমন অত্যাচার করল? সেও তো সাধ আহ্লাদ করে বিয়ে করেছিল। সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘর-সংসার করবে এই আশা তার মনেও ছিল। বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ তোর স্বামী তোকে বেধড়ক পেটাতে শুরু করল কেন।'

শ্যামলী জবাব দিয়েছে, 'ওর নেশাভাঙের জন্যে আমি আপত্তি করতাম বলে। কী বলব বউদি আমার বাবার দেওয়া গয়না এক-খানাও বাকী রাখে নি। প্রথম প্রথম চেয়েই নিত। বলতো আবার ফিরিয়ে এনে দেব। আমি লজ্জায় না করতে পারতাম না। তারপর যখন দেখলাম মুখেই দেব দেব বলে ফেরত আর দেয় না, আমিও তখন শক্ত হলাম। আমিও বললাম দেব না তুমি যা করতে পার করো। দেখলাম আর কোন ক্ষমতা থাকুক আর না থাকুক মারধোর করবার ক্ষমতা খুবই আছে।'

রুনু বউদি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তুই মুখ বুজে সব সহ্য

করতিস ?'

শ্যামলী বলেছিল, 'প্রথম প্রথম তাই করতাম। দাঁতে দাঁত চেপে থাকতাম। শেষে যখন সীমা ছাড়িয়ে গেল দাদার কাছে মার কাছে সব বললাম। দাদা বলল, আগে বলিসনি কেন বোকা মেয়ে ?'

শ্যামলীর দাদা খুব জেদী একরোখা মানুষ।

তিনি বললেন, 'তুই আমার কাছে থাক। আমার যদি দুমুঠো জোটে তোরও জুটবে। অমন স্বামীর ঘর করে তোর আর দরকার নেই।'

একথা শুনে বউদির মুখ হাঁড়ি হয়ে গেল। পাঁচটি ছেলেমেয়ে দাদার। বিধবা মা আছেন। ভরসা একখানি মাত্র মনোহারী দোকান, তাও কোন বড় শহর বন্দরে নয়, নিজেদের গাঁয়ের বাজারে।

'ওই রোজগারে কি এত দর্প মানায় ?' বউদি মুখের ওপরই বলেছিলেন।

শ্যামলীরও ইচ্ছা ছিল না দাদার সংসারে থাকার। তাই বিজয় এসে যখন সাধাসাধি করে তাকে নিয়ে গেল শ্যামলী খুশী মনেই স্বামীর সঙ্গে গিয়েছিল। মানুষের ভুল-ভ্রান্তি হয় আবার দোষ-ত্রুটি সে শুধরেও নেয়। কিন্তু দুদিন যেতে না যেতেই তার ভুল ভাঙল। নিজমূর্তি ধরতে বিজয়ের সময় লাগলো না। বার তিনেক পরীক্ষার পর দাদা বিজয়ের নামে পুলিস কেস করে দিল। সে কেস আদালতে এখনো ঝুলছে। কিন্তু শ্যামলীর আর সাহস নেই স্বামীর ঘরে যাওয়ার। শুধু মামলা কেঁচে যাবে বলেই নয়, শ্যামলীর আর সাহস নেই ওই দস্যুর সঙ্গে একটি রাতও কাটাবার। বিজয়ের মনে যে আক্রোশ তাতে সে যদি শ্যামলীর কোন অঙ্গ হানি করে দেয়।

অস্বাভাবিক ক্রোধ ছাড়াও আরো দোষ আছে বিজয়ের। বহু-দিন আগে থেকেই সন্দেহবাতিক ঢুকেছে তার মনে।

শ্যামলীকে প্রায়ই সে জিজ্ঞাসা করত, 'আমাকে তুই ভালো-বাসিসনে তা আমি জানি। কাকে ভালোবাসিস বল ?'

শ্যামলী বলেছে, 'কাকে আবার ভালোবাসব ?'

'নিশ্চয়ই ভালোবাসিস। তোর চাল-চলন দেখেই আমি তা বুঝতে পারি।'

শ্যামলী বলেছে, 'তা হলে বাসি। আমি যাকে ভালোবাসি সে তোমার মত মদ খায় না, অকথা-কুকথা বলে না, বউকে মারধোর করে না, তার বাক্স ভেঙে গয়নাও চুরি করে পালায় না।'

'কে সে ?' বিজয় তার নাম জানতে চেয়েছে।

সেই বানানো মানুষের নাম ধাম কোত্থেকে বলবে, কিন্তু না বললেও কি রক্ষা আছে ? বিজয় তার গলা টিপে ধরে। শেষ পর্যন্ত নামটাও বানিয়ে বানিয়ে বলে দিয়েছিল শ্যামলী। বিজয় তাকে সত্য বলে ধরে নিয়েছে। ওই নিষ্ঠুর বিচার বিবেচনাহীন মানুষটিকে আর তো কোনভাবে কষ্ট দিতে পারেনি শ্যামলী। শুধু মিথ্যা এক সন্দেহের বিষ ঢুকিয়ে দিয়েছে। 'আমি তোমাকে ভালোবাসিনে। আর একজনকে ভালোবাসি!'

শত থানাপুলিসের সাহায্য নিয়েও তার নাম ঠিকানা বার করতে পারবে না বিজয়। শ্যামলীই কি পারবে ?

শেষবারের মত দাদার সংসারে এসে বউদির গলগ্রহ হয়ে থাকেনি শ্যামলী। ছেলেকে বুড়ী মার কাছে রেখে কাজকর্মের খোঁজে কলকাতায় চলে এসেছে।

রুনু বউদি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কিন্তু তোর ঠিকানা বিজয় কী করে পেল ? আমাদের বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করবার সাহসই বা এল কোত্থেকে ? নিশ্চয়ই তার সঙ্গে তুই যোগাযোগ রেখেছিস।'

শ্যামলী অস্বীকার করে বলেলে, 'না বউদি, মোটেই তা রাখিনি। নিশ্চয়ই আমাদের বাড়ি থেকে ঠিকানা পেয়েছে। নিশ্চয়ই আমার সেই হিংসুটে বউদির কাছে। সে তো আর আমার সুখ-শান্তি দেখতে পারে না। আমি যে দুটো পয়সা রোজগার করি তাও তার সহ্য হয় না।'

সমীরণবাবুরও ব্যাপারটা অজানা রইল না। সেদিন চা খেতে খেতে আমার সামনেই স্ত্রীর সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে আলোচনাও করলেন। রুনু বউদির দিকে চেয়ে তিনি হেসে বললেন, 'তোমার শ্যামলীই যে সতীসাধ্বী, অক্ষরে অক্ষরে সব সত্যকথা বলেছে, তারই বা প্রমাণ কি। নিশ্চয়ই ওরও দোষ আছে। শুধু একজনের

দোষে কি আর ঘর ভাঙে ?'

রুনু বউদি বললেন, 'স্বামীকে মিথ্যে বদনাম দিয়ে ওর লাভ কি।'

সমীরণবাবু বললেন, 'লাভ আছে বইকি। অন্যের সহানুভূতি পাওয়া যায়। এই ঝগড়াঝাঁটি করে তুমিই যদি আমাকে ছেড়ে যাও, তাহলে লোকের কাছে তুমি কি আমার সুনাম গাইবে ? তুমিও তখন বলে বেড়াবে সমীরণ মুখুয্যের মত এমন পাষণ্ড আর দুনিয়ায় নেই। যাকগে ! সত্যি হোক, মিথ্যে হোক ওকে বিদায় দাও। এবার থেকে বয় সার্ভেন্টই রাখব। সেই ভালো। সে বড়জোর পকেট থেকে সিকিটা আধুলিটা সরাবে। বাজার করতে দিলে কিছু কমিশন নেবে। কিন্তু এইসব ঝামেলা ঝক্কি তো পোহাতে হবে না। যেখানে নারী সেখানে গোলমাল।'

রুনু বউদি বললেন, 'কবে যে তুমি গোলমালের অজুহাতে আমাকেও বাদ দেবে তার ঠিক নেই। এদিকে তোমার অফিসে তো মেয়ের অভাব নেই। দশবারোটি নাকি আরো বেশী সেখানে সহকারিণী। কই তাদের বদলে ছেলেদের নেওয়ার কথা তো তোমার মুখে শুনি না ? ছেলে ছবি আঁকিয়ে বুঝি শহরে আর নেই ? কই নাও না আমাদের দীপককে তোমার অফিসে ভর্তি করে ? এ বেলায়ও তো শম্পার ওপরই তোমার পক্ষপাত। শম্পাকেই তুমি আশাভরসা দিয়েছ। দীপককে তো কিছু বলছ না।'

সমীরণবাবু হেসে বললেন, 'দীপক আমার চেয়ে ঢের বড় গাছে নৌকো বেঁধেছে। অনেক বড় জায়গা থেকে আশা ভরসা পাচ্ছে। ওর ভাবনা কি ?'

তারপর মেয়েদের নিয়ে কাজ করবার অসুবিধার কথাও সমীরণবাবু রসিয়ে রসিয়ে বলতে লাগলেন। কারো সঙ্গে একবারের জায়গায় দুবার কথা বললে অন্য মেয়েদের হিংসা হয়। নিজেদের মধ্যে কানাকানি করে অমুক মেয়েটার মুখখানা মিষ্টি বলে বসের নেক-নজরে পড়েছে। ও চড়চড় করে উঠে যাবে। ওর উন্নতি কেউ ঠেকাতে পারবে না। তারপর মেয়েদের ফোন আসা, ভিজিটর আসা নিয়েও কম ঝামেলা পোহাতে হয় না। এদের মধ্যে আবার দু'এক-জনের বন্ধুর সংখ্যা অগুনতি। বাধ্য হয়ে কড়া হতে হয়েছে

সমীরণবাবুকে। পার্সনাল ফোন অ্যালাউ করা হবে না। ভিতরেরও নয়, বাইরেরও নয়। গুরুতর কোন সংবাদই শুধু গ্রাহ্য হবে। নিছক আলাপচারিতা অগ্রাহ্য। অফিস আওয়ার্সের মধ্যে ভিজিটর সম্বন্ধেও কড়াকড়ি করতে হয়েছে। একটু শৈথিল্য দেখালে আর রক্ষা নেই। তরুণী শিল্পীদের অতিথি অভ্যাগতেরা চেয়ার ছেড়ে আর উঠতে চান না। দেখে শুনে সমীরণবাবুর মনে হয় পাবলিসিটির অফিসের সঙ্গে তিনি একটা ঘটকালির অফিস করলেও পারতেন। সেই সাইড বিজনেসেও দুপয়সা হত।

শেষ পর্যন্ত সমীরণবাবুর অফিসে শম্পার চাকরি হয়ে গেল। মিসেস হালদার রুনু বউদির কাছে খুব জোর তদ্বির চালাচ্ছিলেন। মেয়েটা একেবারে ভেঙে পড়েছে। কোন বিয়ের সম্বন্ধই ঠিকমত লাগছে না। কোন অফিস-টফিসে কাজকর্ম নিয়ে আটকে থাকলে মনটা ভালো থাকবে। মাইনেটা বড় কথা নয়। কিছু একটা কাজ নিয়ে থাকা ওর পক্ষে দরকার।

সুতরাং শম্পার কাজ হয়ে গেল। কি ধরনের কাজ তা আমি জিজ্ঞাসা করিনি। শম্পা টাইপ রাইটিংও কিছুদিন শিখেছিল শুনেছি। সমীরণবাবুর অফিসে শম্পার যে কাজ হয়েছে তা পাকা চাকরি নয়। অস্থায়ী শিক্ষানবিসী। তবু শম্পার উৎসাহটা দেখবার মত। সেজেগুজে রোজ অফিসে বেরোয়। লিফটেও এক একদিন দেখা হয়ে যায় আমার সঙ্গে। কোন কোন দিন প্রিয়গোপালবাবুর দরকারি কাজ নিয়ে আমাকে অফিস টাইমেই বেরোতে হয়। হয়তো হেঁটে গিয়ে একই সঙ্গে বাস ধরি।

একদিন বললাম, 'আপনার চাকরি হয়ে গেল ?'

শম্পা বলল, 'একে ঠিক চাকরি বলে না তবু হল একটা কিছু।'

আমি বললাম, 'চাকরি পেলেন, খাওয়াবেন না ?'

শম্পা বলল, 'খাওয়াব। ক্লাবের সবাইকেই খাওয়াব। তবে চা আর চানাচুরের বেশী কিছু আশা করবেন না।'

'আপনি যা দেবেন তাই যথেষ্ট।'

যাতায়াতের পথে আরো একটা দুটো কথা হয়।

শম্পা নিজে থেকেই একদিন বলল, 'আপনাদের এই পাম সৌধে

আমার বেশীদিন থাকা হবে না।'

'কেন ?'

শম্পা বলল, 'দিদি জামাইবাবুর কাছে কতদিন আর থাকব ? হয় নিউ ব্যারাকপুর থেকেই ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করব। আর না হয় সস্তা একটা হস্টেলে-টস্টেল খুঁজে নেব। তেমন কোন মেয়ে হস্টেলের সঙ্গে জানাশোনা থাকলে বলবেন তো ?'

নিতান্তই সাধারণ সৌজন্য। তবু শম্পা যে এই সামান্য দায়িত্বটুকুও আমাকে দিল তাতে আমি খুশী হলাম। বললাম, 'যাওয়ার জন্যে এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন ?'

শম্পা বলল, 'দিদিও সেই কথা বলে। অত ব্যস্ত হচ্ছিস কেন ? জলে তো আর পড়িসনি। জামাইবাবু ঠাট্টা করে বলেন আমি কি কোন আপত্তিকর ব্যবহার করেছি তুমি পালাবার জন্যে ব্যস্ত হচ্ছ। বুড়ো মানুষ। গলিত নখদন্তকে অত ভয় কিসের ? খুব স্ফূর্তি-বাজ, রসিক মানুষ জামাইবাবু।'

'এমন মানুষের সঙ্গ ছেড়ে আপনি তা হলে যাচ্ছেন কেন ?'

শম্পা বলল, 'যত রসিকই হন যত সচ্ছল অবস্থাই ওঁদের হোক বুঝতে তো পারেন নিজের বিবেচনা নিজের কাছে।'

বুঝতে পারি বইকি। সাততলার ওপরে পুরো একখানা ঘর নিয়ে আমি থাকি। একটি পয়সাও আমাকে ভাড়া দিতে হয় না। কত সুযোগ সুবিধা। প্রিয়গোপালের গাড়ি আছে। তাতেও আমি ইচ্ছা করলে বেড়াতে পারি। অবশ্য নিজের কাজে গাড়ি আমাকে ব্যবহার করতে দেওয়া হয় না। কোন কোন সময় বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সঙ্গী হিসাবেই আমি তাঁর গাড়িতে উঠি। আরো অনেক সুযোগ সুবিধা আমার আছে। তাই বলে কি আমি ভাবতে পারি এসব আমার নিজস্ব সম্পদ ? শম্পা বড়লোকের শালী আর আমি বড়লোকের সেক্রেটারি। আগেকার দিন হলে বলত গোমস্তা। আমরা নিজেরা কেউ ধনী নই। আমার মনে হল আমি আর শম্পা একই শ্রেণীভুক্ত। যদিও ও আমার মত একেবারে নিঃস্ব নয়। নিউ ব্যারাকপুরে ওদের ছোট একটি বাড়ি আছে। মা আছেন ছোট ভাই আছে, কলেজে পড়ে। তবু কনে নির্বাচনের পরীক্ষায় যে মেয়ে বার বার অমনোনীতা হয়েছে, বি. এ. পাস করে যে আমার

মতই বসে আছে, কোন কাজকর্ম পাচ্ছে না তার সঙ্গে আমি এক ধরনের আত্মীয়তা অনুভব করি। এই সহানুভূতি শুধু নৈতিবাচক নয়। ওর নম্রতা ওর কমনীয় কান্তি এমন কি ওর গলার সুমিষ্ট স্বর আমার ভালো লাগে। আমার মধ্যে ও কী দেখেছে জানি না। প্রিয়গোপাল বলেছিলেন আমার নির্বাচিত হওয়ার মূলে আছে আমার দৈহিক লাবণ্য। আমি তেমন কিছু একটা সুপুরুষ নই তা আমি জানি। বৃদ্ধের চোখে যে কোন যুবকই সুন্দর, যে কোন যুবতীই মনোরমা। শম্পার চোখে আমায় কী ভালো লেগেছে? ভাবতে ভালো লাগে ও আমার শুধু অভাবটাই দেখেনি, শুধু অনুকম্পা শুধু সহানুভূতিই ওর বন্ধুত্বের ভিত্তি নয়। আমার স্বভাবের মধ্যে ও এমন কিছু পেয়েছে যাতে ও আকর্ষণ বোধ করেছে। সামান্য হলেও এই পারস্পরিক আকর্ষণের মত মাধুর্য বোধহয় আর কিছুতেই নেই। এই পঞ্চান্নটি ফ্লাটে শুধু তো প্রিয়গোপালের মত বৃদ্ধেরাই বাস করে না। কৃতী অকৃতী নানা বয়সী যুবকদেরও এখানে অভাব নেই। কিন্তু শম্পা নিজেই আমাকে বলেছে এখানে আর কোন ছেলের সঙ্গে তার আলাপ হয়নি। আলাপ পরিচয় করার আগ্রহও সে বোধ করেনি। অন্ততঃ এই পাম এভেনিউতে আমিই শম্পার একতম—এ কথা ভাবতে যে আমার ভালো লাগে তা স্বীকার করতে আমার লজ্জা নেই। তাই বলে আমি এমন পাগল হইনি এই সামান্য আলাপ পরিচয়কে প্রেম —এমন কি বন্ধুত্ব বলে ভাবব। কি এই সম্পর্কের একগাছি সূত্রকে অবলম্বন করে আদিঅন্তহীন এক সোনার জাল বুনতে শুরু করব। এখন পর্যন্ত আমরা কেউ কাউকে নিজেদের বাড়িতে ডাকিনি, রেস্টুরেণ্টে চা খেতে যাইনি, একসঙ্গে দূরে কোথাও বেড়াইনি, গল্প করিনি, পাম স্টেটের এই কম্পাউণ্ডের মধ্যেই শুধু দিনে দু একবার করে আমাদের দেখা হয়, কথা হয়। হয়তো কখনো কখনো আবিষ্কার করি লিফটের খাঁচার মধ্যে আমরা শুধু দুজনই আছি।

মাত্র এইটুকু। তবু এই নিয়ে রুনু বউদির ঠাট্টা তামাশার শেষ নেই।

'ডুবে ডুবে কী খাওয়া হচ্ছে?'

জবাব দিই, 'সবাই যা খায়, জল।'

'উঁহু, তুমি জলের চেয়ে আরো যেন কিছু বেশী খাচ্ছ।'

'তা হলে তাই খাচ্ছি।'

রুনু বউদি বললেন, 'দেখো যেন শেষ পর্যন্ত খাবি খেয়ো না।' তারপর হেসে বললেন, 'জানো, শর্মিষ্ঠা তোমার খোঁজখবর নিচ্ছিলেন।'

বললাম, 'তাঁর সঙ্গে তো আমার প্রায় রোজই দেখা হচ্ছে। খোঁজ নেওয়ার আবার কী আছে?'

'আহা, সে ধরনের খোঁজ নেওয়া নয়। তথ্য গো তথ্য। তোমার সম্বন্ধে কিছু তথ্য ওরা সংগ্রহ করতে চায়। তোমার কোথায় বাড়ি ঘর, সংসারে কে কে আছেন, মিঃ দত্তগুপ্তের অফিসে তোমার কী ধরনের কাজ—কত মাইনে—'

রুনু বউদির মুখে হাসি। একবার পরিহাস করতে শুরু করলে এই ভদ্রমহিলার অবক্তব্য কিছু থাকে না। কিন্তু সবটা একেবারে বানানো নাও হতে পারে।

শম্পার চাকরি হল, কিন্তু শ্যামলীর চাকরিটি নেই। আমাদের সপ্তম ফ্লোরে এটা একটি ঘটনা। এই বিরাট পৃথিবীতে কত বড় বড় ঘটনা ঘটছে, কত রাজ্য ভাঙা-গড়া, কত যুদ্ধবিগ্রহ, কত সরকারের উত্থানপতন। কিন্তু সেইসব ঘটনাবলী শুধু খবরের কাগজে পাঠ্য। কি রেডিওতে শ্রাব্য। তাদের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত কোন যোগাযোগ নেই। কিন্তু আমার ঘরের কোণে যদি একটু ইঁদুর মরে তাকে বার করে না ফেলা পর্যন্ত আমার নিস্তার নেই। আমরা যে বৃহৎ বিশ্বে বাস করি এমন কি নিজের দেশে কি শহরে বাস করি সে যেন এক ভাবরাজ্যে বাস। কিন্তু আসল বসবাস আমাদের অতি সংকীর্ণ সীমিত একটি স্থানে। দুচারজন আত্মীয়-স্বজন, কয়েকজন বন্ধু-শত্রু যারা আমাকে খুন জখম করে না, কিন্তু যারা আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে, আমার মনে দ্বেষ বিদ্বেষ উৎপাদন করে। এরাই আমার অন্ধ বিশ্বের বাসিন্দা।

পাশের ফ্লাটের একটি রাঁধুনির চাকরি গেল তাতে আমার কি এসে যায়? কিন্তু দেখা গেল এসে যায়। ঘটনাক্রমে আমি আর

আমার মনিষ এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়লাম।

বিজয় তার ভগ্নীপতি কেশবকে নিয়ে ভর দুপুরে আবার একদিন হামলা করতে এল। সেদিন আমি বাড়িতে ছিলাম না। প্রিয়গোপালবাবুর কিছু কাজ ছিল আর আমার নিজের ছিল একটা ইণ্টারভিউ। সন্ধ্যার পর ফিরে এসে রুনু বউদির কাছে শুনলাম ব্যাপারটা। বিজয় ফের এসেছিল। টেকনিক সেই একই। কখনো তর্জনগর্জন করে, থানা পুলিসের ভয় দেখায় আবার পরমুহূর্তেই কাকুতিমিনতি, গলে সে একেবারে পায়ের কাদা হয়ে যায়। শ্যামলীর মন মাঝে মাঝে টলে ওঠে। শত হলেও স্বামী তো। একসঙ্গে বসবাস করেছে। ছেলের মুখের হাসি দেখেছে। সেই যৌথ সৃষ্টি, দুজনের সেই আনন্দের আধারকে নিয়ে একই সঙ্গে আদর আহ্লাদ করেছে। শ্যামলীর মন দ্বিধায় দুলতে থাকে। পুরোপুরি ভরসা পায় না। যাবে যে, আবার যদি মারধোর শুরু করে। আগের মতই যদি টেঁকা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। উকিল দাদাকে বলে দিয়েছেন আবার গিয়ে একসঙ্গে বসবাস আরম্ভ করলে মামলা কেঁচে যাবে। বিবাহবিচ্ছেদের ডিক্রী পাওয়া যাবে না।

রুনু বউদি বলেছেন, 'যা করবি ঠিক করে ফেল। কাজ যদি করতে হয় কর, স্বামীর ঘর করতে যদি হয়, ছেড়ে দিয়ে চলে যা। মাঝামাঝি কোন রাস্তা নেই। তোর জন্যে এই ঝামেলা পোহাবে কে?'

আরো একটা ব্যাপার আছে। শ্যামলীর শ্বশুর ছেলের এই অনাচার কদাচারের বহর দেখে সম্পত্তির কিছু অংশ নাতির নামে লিখে দিয়ে গেছেন। গ্রামে তাঁর কিছু জায়গা জমি আছে। তাঁর কীর্তিমান ছেলে এখনো সেটুকু বেচে খেতে পারেনি। স্ত্রীকে বার বার ফিরিয়ে নিতে আসার মূলে বিজয়ের কতখানি পত্নীপ্রেম, কতখানিই বা সম্পত্তির লোভ সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারছে না শ্যামলী।

রুনু বউদি বললেন, 'তা হলে এক কাজ কর। তুই চলে যা তোর সেই দাদার কাছে। তিনিই তো তোর অভিভাবক। তাঁর পরামর্শ মত তোর চলা উচিত। সেখানে বিজয়ও যেতে পারে। সেখানে যদি তোদের নিষ্পত্তি হয়ে যায় খুবই ভালো। আমাদের একটা পোস্টকার্ড দিয়ে জানিয়ে দিস।'

'আর যদি নিষ্পত্তি না হয়, আমাকে ছাড়িয়ে দেবেন না তো বউদি ?'

রনু বউদি ভরসা দিয়েছিলেন, 'না না, ছাড়াব কেন। তোর চাকরি তো এখানে রইলই।'

যাওয়ার সময় শ্যামলী আমার কাছেও বিদায় নিয়েছিল, 'চললাম।'

বলেছিলাম, 'কী আশীর্বাদ করব ? সুখে শান্তিতে স্বামীর ঘর করো।'

শ্যামলী লজ্জিত হয়ে বলেছিল, 'আহা।'

তারপর একটু বাদে বলেছিল, 'সেই সুখ কি আমার হবে।'

'কেন হবে না ?'

'কী জানি অদৃষ্টে কী আছে।'

প্রিয়গোপালবাবু আর মিসেস দত্তগুপ্তকেও প্রণাম করেছিল শ্যামলী।

মিসেস দত্তগুপ্ত বলেছিলেন, 'মতি বুদ্ধি স্থির করে যা হয় করো। মেয়েদের অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়। তারা সহ্য করবার জন্যই সংসারে আসে।'

তারপর স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'হাসছ যে ?'

প্রিয়গোপাল তেমনি স্মিতমুখে জবাব দিয়েছিলেন, 'কখনো কখনো এর উলটোটাই দেখি কিনা। **Tyranny of the weak.** অবলাদের অত্যাচারই হল পৃথিবীতে নিষ্ঠুরতম অত্যাচার।'

দুজনেই ঘর থেকে চলে গেলে প্রিয়গোপাল মন্তব্য করেছিলেন, 'মেয়েটির ফিচার টিচার তো বেশ শার্প। মনেই হয় না ঝি কি রাঁধুনী।'

যেন সত্তর বছরের বৃদ্ধ নয় সতের আঠের বছরের বকাটে ছোকরা একটি মেয়ের দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়েছে।

আমি বললাম, 'এমন মাঝে মাঝে দেখা যায়। সমাজ যেখানে কৃপণ, প্রকৃতি সেখানে উদার—'

প্রিয়গোপাল বললেন, 'আমি অপ্সরাদের দেশেও ঘুরেছি। কাশ্মীরে। তাদের যত রূপই থাক, মুখে একটা ডালনেস থাকে। অশিক্ষার আবরণ। শ্যামলী সে দিক থেকে অনবগুণ্ঠিতা। অথচ

ও তো লেখাপড়া জানে না।'

আমি বললাম, 'সামান্যই জানে। খবরের কাগজ পড়ে, সিনেমা ম্যাগাজিনগুলি নিয়ে টানাটানি করতেও দেখেছি।'

প্রিয়গোপাল হেসে বললেন, 'তুমি তো অনেক দেখেছ দীপকচাঁদ। যুবক তুমি প্রভূত পর্যবেক্ষণশক্তির অধিকারী। একথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে।'

হেসে বললাম, 'এইটুকু দেখবার জন্যে পর্যবেক্ষণ শক্তিরও দরকার হয় না, আর্যদৃষ্টিরও দরকার হয় না। সাদা চোখেই এটুকু দেখা যায়।'

তিনি বললেন, 'সাদা চোখ। **Common sense** যেমন **most uncommon attribute** তেমনি সাদা চোখও সহজে বড় একটা চোখে পড়ে না। কোন না কোন রকমের নেশার রঙ তোমার চোখে লেগেই আছে ভাই। কোন না কোন ধরনের চশমা তোমাকে পরতেই হবে।'

বললাম, 'কী জানি। আমাকে তো এখন পর্যন্ত কোন চশমা নিতে হয়নি।'

তিনি বললেন, 'খুব যে অহংকার। আরে চশমা কি শুধু চোখের ডাক্তাররাই পরায়?'

মিসেস দত্তগুপ্ত ইতিমধ্যে দিল্লী গেলেন। বড় ছেলের কাছ থেকে ডাক এসেছে। তাঁর স্ত্রীর শরীর ভাল যাচ্ছে না, 'মা তুমি তুমি কদিন এসে আমাদের কাছে থেকে যাও।'

যাওয়ার সময় তিনি স্বামীকে বললেন, 'তুমিও চল।'

প্রিয়গোপাল বললেন, 'উঁহু জীবনসঙ্গী তোমার, ভ্রমণের সঙ্গী তো নয়। তুমি ঘুরে এসো।'

প্রিয়গোপাল স্ত্রীর দিল্লী যাওয়ার সঙ্গী জুটিয়ে দিলেন, আমাকে সঙ্গে নিয়ে হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত **see off** করে দিয়ে এলেন, কিন্তু তাঁর সঙ্গে কিছুতেই গেলেন না।

মিসেস দত্তগুপ্ত বললেন, 'লিফট বন্ধ থাকলে তুমি কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে কখনো ওঠানামা কোরো না। এমনিতেই হার্টের দোষ আছে, শেষে একটা হিতে বিপরীত হয়ে যাবে।'

প্রিয়গোপাল বললেন, 'দেখ, আমার নানারকম মৃত্যুর পরিকল্পনা আছে। যুদ্ধ জানি না, রণক্ষেত্রে বীরের মৃত্যু তো আর ভাগ্যে নেই। কিন্তু নানা জায়গায় নানাভাবে বহুরূপী মৃত্যুর আমি কল্পনা করি। প্লেনে উড়ে যেতে যেতে মৃত্যু, গভীর সমুদ্রে সলিল সমাধি, নিদেন পক্ষে সিঁড়িতে উঠতে উঠতে মৃত্যু। যারা দেখবে তারা ভাববে লোকটা ঊর্ধ্বগামী হওয়ার চেষ্টা করেছিল বটে।'

মিসেস দত্তগুপ্ত বললেন, 'কেবল কথা আর কথা। ওসব অলুক্ষণে কথার দরকার নেই। একটু সাবধানমত থেকো। সেই রক্তের জোর আর নেই একথা মনে রেখো।'

প্রিয়গোপাল বললেন, 'মনে রাখার কথা কী বলছ। প্রতি মুহূর্তে তাই নিয়ে আপসোস করি। আমার কথা ভেব না। আমার একজন ইয়ং বডিগার্ড সব সময় আমাকে আগলে বেড়াবে। দীপক শুধু আমার সেক্রেটারি নয়, বিবেকেরও কাস্টডিয়ান। নিদারুণ নীতিবাগীশ এই ছেলে।'

মিসেস দত্তগুপ্ত আমাকে আলাদাভাবে ডেকে তাঁর বৃদ্ধ স্বামীর যত্ন নেওয়ার কথা বলে গেলেন। ওঁর নানা রকম বাতিক আছে সেগুলিকে যেন আমরা প্রশ্রয় না দিই। ছেলের ডাকে তিনি বাইরে যাচ্ছেন বটে কিন্তু বেশী দিন সেখানে কিছুতেই থাকবেন না। রুনু বউদিকেও তিনি কিছু কিছু দেখাশুনার ভার দিয়ে গেলেন। বউদি বললেন, 'আপনি ভাববেন না মাসীমা। আমরা থাকতে ওঁর কোন অযত্ন হবে না।'

দিল্লীতে পৌঁছে মিসেস দত্তগুপ্ত টেলিগ্রাম করে পৌঁছসংবাদ দিলেন। কিন্তু শ্যামলীর কোন খবর পাওয়া গেল না। এক সপ্তাহ গেল, দু সপ্তাহ গেল। দিন তিনেক থেকেই ওর ফিরে আসার কথা। ফিরে যদি নাও আসে কী হয়েছে জানাবার কথা। কিন্তু এতদিনের মধ্যেও কোনও খোঁজ খবরই দিল না, আশ্চর্য ব্যাপার।

রুনু বউদি চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তাঁর চেয়েও বেশী চঞ্চল হলেন সমীরণবাবু। তিনি বললেন, 'তোমার শ্যামলী নিশ্চয়ই সুখে শান্তিতে স্বামীর ঘর করছে। এবার আর একজনকে রেখে দাও।'

রুনু বউদি বললেন, 'তুমি ব্যস্ত হচ্ছ কেন?'

সমীরণবাবু বললেন, 'ব্যস্ত হচ্ছি তোমার অবস্থা দেখে। ঝি

চাকর ছাড়া তুমি যে একেবারে অচল। দিনরাত মেজাজ খিটখিটে হয়েই আছে। ঝি-এর জন্যে আমি কি শেষে বউকে খোয়াব।'

যে কথা সেই কাজ। সমীরণবাবু নিজেই একটি কাজের লোক খুঁজে আনলেন। মেয়ে না, ছেলে। তাঁর অফিসেরই অ্যাকাউনট্যাণ্ট সুপারিশ করে দিয়েছেন। খুব চেনা জানা বিশ্বাসী। ঘরের কাজ বাইরের কাজ সব ওকে দিয়ে চলবে।

রুনু বউদি বেশী আপত্তি করলেন না। সত্যি তাঁর অসুবিধা হচ্ছিল। শ্যামলীর ভরসা আর তিনি বেশী করতে পারছিলেন না।

নতুন ছেলেটির নাম প্রসাদ। সে এসে কাজে যোগ দিতে না দিতেই শ্যামলী এসে হাজির।

রুনু বউদি তাকে দেখে গম্ভীর মুখে বললেন, 'এতদিন তুই কোথায় ছিলি? একখানা চিঠি পর্যন্ত দিতে পারিস নি। আমি তো লোক রেখে দিয়েছি।'

শ্যামলী কাতর ভাবে বলল, 'সেকি বউদি, আমার তা হলে কি উপায় হবে?'

রুনু বউদি বললেন, 'আমি কী করব বল? আমরা তো মনে করলাম তুই তোর স্বামীর কাছে চলে গিয়েছিস।'

শ্যামলী মৃদুস্বরে বলল, 'না বউদি তা হয়নি। সে একবার এসেছিল। দাদার সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করে চলে গেছে। তার কাছে গিয়ে আর থাকা হবে না।'

'তবে এলি না কেন সময়মত?'

'ছেলের টাইফয়েড হয়েছিল বউদি। সে কিছুতেই ছাড়তে চাইল না।'

রুনু বউদি বললেন, 'একখানা চিঠি তো দিতে পারতিস। আমি এখন কী করব বল। আমি একজন লোক যে রেখে ফেলেছি।'

শ্যামলী বলল, 'তাহলে আমার অন্য কোথাও একটা ব্যবস্থা করে দিন।'

রুনু বউদি বললেন, 'আমি এখন কোথায় কি ব্যবস্থা করব। আমি যাদের জানি তাদের সবাইয়েরই কাজের লোক আছে। মাসীমা যদি থাকতেন—' তারপর একটু ভেবে বললেন, 'দীপক,

তুমি যদি মেসোমশাইকে একবার বলো। অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যে তিনি ওঁর একটা ব্যবস্থা করতে পারেন কিনা। তোমাদের বাড়িতে অবশ্য কাজের লোক আছে। কিন্তু মাসীমা মাঝে মাঝে দুজনকেও রাখেন।'

আমি বললাম, 'চলুন, তাহলে দুজনেই গিয়ে বলি।'

প্রিয়গোপাল সব শুনলেন। তারপর রুনু বউদির দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'তুমি খুশী মনে দিচ্ছ তো রুনু? দেখো তোমার সঙ্গে এই নিয়ে শেষে একটা মনোমালিন্য না হয়।'

রুনু বউদি হেসে বললেন, 'মনোমালিন্য কেন হবে? আমি তো ইচ্ছা করেই শ্যামলীকে আপনার হাতে দিচ্ছি।'

'সম্প্রদান করছ?'

রুনু বউদি একটু যেন লজ্জিত হলেন। তারপর হেসে বললেন, 'সম্প্রদান বই কি। আমি ওকে আর ফিরিয়ে নেব না। আজ-কালকার দিনে দুটি লোক পোষা কি চাট্টিখানি কথা?'

প্রিয়গোপাল বললেন, 'আমি কী করে পুষব?'

রুনু বউদি বললেন, 'আপনার সঙ্গে কার তুলনা? আপনার কি টাকার অভাব আছে নাকি?'

প্রিয়গোপাল বললেন, 'অভাবের কি শেষ আছে রুনু? যার কোটি টাকা আছে সে আরো এক কোটি টাকা চায়। অভাব থাকলেও আমি আর টাকা চাইনে। টাকা দিয়ে করব কী! টাকা দিয়ে যে জিনিস কিনব সে জিনিস তো ভোগ করতে পারব না। আমি এমন একজনকে চাই যার সঙ্গে দিনরাত আমার ভাবের সম্পর্ক থাকবে।'

রুনু বউদি মুখ টিপে হেসে বললেন, 'দেখুন তেমন কাউকে পান কিনা।'

৪

শ্যামলীকে ডেকে নিয়ে কাজ বুঝিয়ে দিলেন প্রিয়গোপাল বাবু। 'শোন, তোমাকে রান্নাবান্না করতে হবে না।'

শ্যামলী বলল, 'তবে কি শুধু বাসনমাজা ঘর ঝাঁট দেওয়া—'

প্রিয়গোপাল বললেন, 'উঁহু, ওসবও তোমাকে দেখতে হবে না! তার জন্যে আমার আলাদা লোক আছে।'

বিস্ময়ে শ্যামলীর বড় বড় চোখ দুটি আরো বড় হল।

'আমি তা হলে কী করব?'

প্রিয়গোপাল বললেন, 'আমি যা বলছি তাই করবে। দেখেছ তো আমাদের টেলিফোন এসে গেছে?'

শ্যামলী বলল, 'দেখেছি।'

প্রিয়গোপাল বললেন, 'আমার যত টেলিফোন আসে তুমি ধরবে। জানো তো ধরতে?'

শ্যামলী মৃদু হেসে বলল, 'জানি। বউদি শিখিয়ে দিয়েছেন।'

'নাম্বার বলে দিলে টেলিফোন করতে পার বাইরে?'

শ্যামলী বলল, 'তাও পারি।'

প্রিয়গোপাল বললেন, 'রুনুর কাছে তুমি অনেক শিখেছ। এখানে আরো অনেক বেশী শিখবে। এক নম্বর তুমি হবে আমার টেলিফোন অপারেটর। দু'নম্বর তুমি হবে দীপকবাবুর অ্যাসিস্ট্যান্ট, সহায়িকা, সহকর্মিনী। ওখানে কত টাকা মাইনে পেতে?'

'মাসে তিরিশ টাকা।'

প্রিয়গোপাল বললেন, 'এখানে একশ করে দেব। দীপক you should not grudge. তোমারও মাইনে বাড়বে। তবে ওকে তোমার শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে হবে। এটা তোমার কাজ। It will be a pleasant duty, I think.'

শ্যামলীর কাজ শুরু হয়ে গেল। যে টেবিলে আমি বসে কাজ করি সেখানে আমার সামনে প্রিয়গোপালবাবু আরো একখানি চেয়ার আনিয়ে দিলেন। সেই চেয়ারে বসতে শ্যামলীর ভারী সংকোচ। প্রথম প্রথম সে দাঁড়িয়েই রইল। কিন্তু প্রিয়গোপাল মাঝে মাঝে আমাদের ঘরে আসেন। ওকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেই জোর করে এসে বসিয়ে দিয়ে যান।

শেষ পর্যন্ত আড়ষ্টতা কাটল শ্যামলীর। আমিও বললাম, 'বোসো, বসে কাজ করো।'

শ্যামলী প্রিয়গোপালের মত অবুঝ নয়। সংসারের অন্য কাজকর্ম থেকেও একেবারে দূরে সরে রইল না। তবে নিজের

হাতে সব আর করে না। ডিরেকসন দেয়। বিছানাপাতা ঘরদোর সাজানো-গোছানো সব অবশ্য নিজেই করে। প্রিয়গোপাল চেয়ে চেয়ে দেখেন আর ওর কর্মব্যস্ত গতিশীলতাকে উপভোগ করেন।

রাত্রে অবশ্য শ্যামলী আমাদের ফ্লাটে থাকে না। সে রুনু বউদিদের ফ্লাটে গিয়েই শোয়। শ্যামলী নিজেই এই ব্যবস্থা করে নিয়েছে। বলেছে উনি দিল্লী থেকে ফিরে আসুন তারপর ওখানে থাকব। রুনু বউদিও সেই ব্যবস্থাই সমর্থন করেছেন।

তবু রাত এগারোটা পর্যন্ত প্রিয়গোপাল ওকে আটকে রাখেন। কাজকর্মের জন্যে নয়, গল্প করার জন্যে। খাওয়া আমাদের সকাল সকালই হয়ে যায়। শ্যামলীকে একই টেবিলে বসে আমাদের সঙ্গে খেতে হয়। পরিবেশন করে কার্তিক—আমাদের কমবাইন্ড হ্যান্ড। প্রথম প্রথম শ্যামলীর মত আমিও অস্বস্তি বোধ করতাম। এই সেদিনও পাশের বাড়িতে যাকে রাঁধুনীগিরি, ঝিগিরি করতে দেখেছি তাকে সমমর্যাদা দেওয়া বড় কঠিন। কিন্তু ধনী সম্ভ্রান্ত প্রিয়গোপাল যদি পারেন, আমিই বা তা পারব না কেন। তার চেয়ে তো আমার মর্যাদা বেশী নয়।

কিন্তু মুশকিল হয়েছে শ্যামলী নিজের যোগ্যতায় ওপরে উঠে আসেনি। প্রিয়গোপাল নিজের খেয়ালে ওকে ওপরে তুলে এনেছেন।

দিনের পর দিন তাঁর খেয়ালের মাত্রা বেড়ে যেতে লাগল। একদিন গাড়িতে করে আমাকে নিয়ে বেরোলেন। শ্যামলীকেও ডেকেছিলেন সঙ্গে। কিন্তু সে কিছুতেই যেতে চাইল না। প্রিয়-গোপাল খানকয়েক দামি শাড়ি কিনলেন। স্টেশনারি দোকানে ঢুকে স্নো পাউডার রুজ লিপস্টিক কিনলেন। নিজে দিলেন না, আমার হাত দিয়ে শ্যামলীকে সেগুলি উপহার দিলেন।

শ্যামলী শাড়িগুলি পেয়ে খুশী হল। কোন্ মেয়েই বা তা না হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'এত দামী শাড়ি আমি পরে বেরোব কী করে? লোকে কে কী বলবে।'

প্রিয়গোপাল বললেন, 'লোকের বলাবলিতে কী এসে যায়।'

অবশ্য প্রিয়গোপাল শুধু যে ওপরেই মাজাঘষা চালালেন তা নয়। শ্যামলীর বিদ্যাবুদ্ধির সংস্কারের কাজেও লেগে গেলেন।

সকালে দু-ঘণ্টা, বিকালে দু-ঘণ্টা নিয়মিত তিনি ওকে পড়ান। তিনি নিজেই সিলেবাস ঠিক করে দিয়েছেন, বই খাতা কিনে দিয়েছেন। লক্ষ্য করে দেখেছি যখন প্রিয়গোপাল ওকে পড়ান তখন তিনি খুব সিরিয়াস। এত বকবক করার অভ্যাস, কিন্তু তখন একটিও বাজে কথা বলেন না। শেখাবার পদ্ধতি প্রকরণও ওর বেশ আয়ত্তে আছে দেখলাম।

আমি একদিন বলেছিলাম, 'আপনি তো পড়াতে টড়াতে বেশ পারেন দেখছি।'

প্রিয়গোপাল বললেন, 'পারব না কেন। স্কুল কলেজে যখন পড়তাম দুবেলা টিউশনি বাঁধা ছিল। ভেব না রুপোর চামচ মুখে নিয়ে জন্মেছি। আমার তুলনায় আমার ছেলেরা অনেক বেটার স্টার্ট পেয়েছে। সে কথা তারা স্বীকার করুক আর নাই করুক।'

তারপর শ্যামলীর দিকে তাকিয়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে বললেন, 'তোমাকে কতটুকু কী দিয়ে যেতে পারব জানি না। কদিনই বা আর আয়ু আছে। কিন্তু একটি মন্ত্র তোমার কানে কানে গুন-গুন করে যাব। সে হল উচ্চাভিলাষের মন্ত্র। তোমাকে উঠতে হবে, ওপরের দিকে উঠতেই হবে। বুঝলে দীপক, উচ্চাকাঙ্ক্ষা মাত্রেই খারাপ নয়। দেখতে হবে সেটা তুচ্ছাকাঙ্ক্ষা কিনা। আর হীনপথে অন্যকে মেরে ধরে তুমি সেই আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা চাইছ কিনা। শুধু বিত্ত প্রতিপত্তি নয়, শিল্প সাহিত্যের উৎকর্ষই বল আর আধ্যাত্মিক উপলব্ধিই বল, সব উৎকর্ষের মূলে আছে এই উচ্চাভিলাষী প্রয়াস। হ্যাঁ, প্রয়াস চাই। শুধু অফুরন্ত ইচ্ছা নিয়ে বসে থাকলেই চলবে না। You must strive.'

প্রিয়গোপাল যেন নতুন এক উদ্দীপনা পেয়েছেন, নতুন উদ্যম আর কর্মশক্তি। আগে এতটা বেরোতেন না। আজকাল গাড়ি নিয়ে প্রায় বেরোন। শ্যামলীকেও মাঝে মাঝে সঙ্গে ডাকেন, সে অবশ্য যায় না। কিন্তু আমাকে যেতে হয়। আজকাল প্রিয়গোপাল তাঁর পুরোন বন্ধুদের খোঁজখবর নিতে যান। একটা সাহিত্য আসরের তিনি বহুদিনের সদস্য। কিন্তু কোনদিন যেতেন না। আজকাল কোন কোন মিটিংএ গিয়ে তিনি হাজির হন। গল্পগুজব করেন। কোন কোন বার দুএকটি প্রবন্ধও পড়েন। রসসাহিত্যের

আলোচনা সমালোচনা। রসিকদের মধ্যে প্রায় সবাই প্রবীণ। পাকা মাথা। অবশ্য কেউ কেউ কলপ পরে চুল কাঁচা করেও আসেন।

ওঁর এক উকিল বন্ধুর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। নাম নিকুঞ্জ সেহানবীশ। তিনি যতবারই আমাকে দেখেন জিজ্ঞাসা করেন, 'প্রিয়, ছেলেটি কে?

প্রিয়গোপাল হেসে বললেন, 'তোমাকে আরো দুবার বলেছি। তুমি মনে রাখতে পার না, এত bad memory নিয়ে তুমি প্র্যাকটিস চালিয়ে যাচ্ছ কী করে?'

মিঃ সেহানবীশ বললেন, 'আরে ভাই আসামী আর সাক্ষীদের নাম মনে রাখতে রাখতেই স্মৃতিভাণ্ডার ভরে যায়। আর কারো সেখানে বড় একটা জায়গা হয় না। বাপ দাদার নাম নিতান্তই ছেলেবেলা থেকে কণ্ঠস্থ করেছি তাই মনে আছে। কত প্রিয় নাম যে ভুলেছি তার ঠিক নেই। তুমিও ভুলেছ প্রিয়।'

প্রিয়গোপাল বললেন, 'ঠিক আছে আমার এই ইয়াং সেক্রেটারির নাম নিয়ে তোমাকে আর বদার করতে হবে না। তুমি শুধু ওর মুখখানি চিনে রাখো, রূপটুকু দেখে রাখো তাহলেই চলবে।'

মিঃ সেহানবীশ বললেন, 'ঠিক আছে। আচ্ছা সেদিন ফোনটা কে ধরেছিল। বেশ মিষ্টি গলা। মিসেসের গলা বলে তো মনে হল না।'

প্রিয়গোপাল বললেন, 'না মিসেসের গলা কেন হবে! তার গলা আরো মধুর। তোমাকে কষ্ট দিয়েছিল আমার আরেক সেক্রেটারি। মিস শ্যামলী, আমার সেকেণ্ড সেক্রেটারি।'

'বাবা কজন সেক্রেটারি রেখেছ? আমরা একজনই রাখতে পারিনে।'

প্রিয়গোপাল হেসে বললেন, 'এসো না আমার ওখানে একদিন। এখন তো সিঁড়ি ভাঙার কষ্ট নেই। লিফট হয়ে গেছে। চিনির বস্তার মত তোমাকে ওপরে তুলে নেবে।'

সেহানবীশ বিজি প্র্যাকটিশনার। তাঁর আসার সময় হল না। তবে প্রিয়গোপালের অন্য দুএকজন বন্ধু এলেন। প্রিয়গোপাল তাঁদের সঙ্গে শ্যামলীর আলাপ করিয়ে দিলেন। শ্যামলী প্রথম

প্রথম একটু আড়ষ্ট হয়ে থাকত। এখন তাঁর চলন বলন বেশ স্বতঃস্ফূর্ত।

মেয়েদের গ্রহণের দক্ষতা আছে। শ্যামলীর দক্ষতা আরও বেশী।

সে অবশ্য দামী শাড়িগুলি পরে না। ক্বচিৎ কখনো প্রিয়গোপালের অনুরোধে পরে। কিন্তু বাইরে বেরোয় না। কেবল বলে, 'লোকে কি বলবে।'

অবশ্য পরবার কায়দাটি ও বেশ আয়ত্ত করে নিয়েছে। কম দামী শাড়িতেও ওকে ভালোই দেখায়।

শ্যামলী বাইরে না বেরোলে কি হবে, আমি আর প্রিয়গোপাল যখন বেরোই আমার মনে হয় পাম স্টেটের বাকি চুয়ান্নটি ফ্লাটের লোক সহস্র চক্ষু হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের দৃষ্টির অর্থ বুঝতে আমার দেরি হয় না। সেই চোখে উপহাস বিদ্রূপ পরিহাস সবই আছে। কিন্তু প্রিয়গোপাল নিজে যেন এক নতুন নেশায় মেতেছেন। সেই নেশায় তিনি বিভোর হয়ে থাকেন, অন্য কিছু যেন তাঁর চোখে পড়ে না। কি চোখে পড়লেও তিনি ভ্রূক্ষেপ করেন না।

কিন্তু আমি চারপাশের পরিবর্তন লক্ষ্য না করে পারি না। রুনু বউদি আজকাল আর আমার সঙ্গে তেমন হেসে কথা বলেন না। দেখলেই কেমন যেন গম্ভীর হয়ে যান। তাঁর ড্রয়িংরুমে অনামিকার বৈঠক এখনো বসে। কিন্তু আশ্চর্য আমার আর সেখানে ডাক পড়ে না।

এক এক সময় ভাবি আমি নিজেই যাই। গিয়ে সরাসরি জিজ্ঞাসা করি, 'কী অপরাধ আমার? কী ভেবেছেন আপনারা।'

কিন্তু আত্মসম্মানে বাধে। ভাবুন ওঁরা যা খুশী তাই। আমার কিছুতেই কিছু এসে যায় না।

কোন কোনদিন আমি বাড়িতে পড়াশোনা নিয়ে থাকি, যতদূর পারি প্রিয়গোপালের লাইব্রেরী থেকে বই নিয়ে আসি। তাঁর আলমারিগুলির চাবি কোথায় থাকে আমি জানি। আগে আগে ওঁর আলমারি আমি খুললে তিনি খুঁতখুঁত করতেন। আজকাল আর তা করেন না। বলেন, 'নাও খুলে নিয়ে পড়। এসব তো

তোমাদেরই। বই তুমি কার? যে পড়ে তার।'

রুনু বউদিদের আসরে অযাচিতভাবে আমি আর যাইনে। ভাবি ভালোই হয়েছে। মেয়েদের সঙ্গে মিশে মিশে আমার স্বভাবের মধ্যে এক ধরনের নারীত্ব এসে গিয়েছিল। বরং পুরোন বন্ধুদের খোঁজখবর নিতে যাওয়া ভালো। যদিও সেই পুরোন বন্ধুত্বের স্বাদ কদাচিৎ পাই, তবু এ ব্যাপারে আমি খুবই অধ্যবসায়ী। ভাবি যেটুকু পাই তাই বা কম কিসে?

কিন্তু একটি ব্যাপারে আমি মনে মনে খুব আহত হলাম। শম্পাও আমার সঙ্গে দূরত্ব রেখে চলতে শুরু করেছে। কখন যে অফিসে বেরোয় কখন ফেরে আমি টেরই পাই না। দেখা হলে ও যেন কথা বলতেই চায় না। আগেও যে আমাদের মধ্যে খুব গল্প-সল্প হত তা নয়। তবু একটি দুটি কথায় যেন অনেকখানি বক্তব্য প্রকাশ হয়ে যেত। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আমরা এক ধরনের অন্তরঙ্গতা অনুভব করতাম। তার স্বাদ বলে বোঝানো যায় না। কিন্তু সেই শম্পা যেন এখন এক তুহিনশীতল দেশের অধিবাসিনী। কথা বলে কি বলে না, তাকিয়ে দেখে কি দেখে না।

এখনো এমন দিন আসে যখন আমি আর শম্পা লিফটে অন্ততঃ কয়েকটা ফ্লোর নিরিবিলিতে নামি। কিন্তু শম্পা এত দূরে গিয়ে দাঁড়ায়, মুখ ফিরিয়ে এমন বোবা হয়ে থাকে, যে আমার মাঝে মাঝে দারুণ রাগ হয়। আমার ইচ্ছা হয় ওর কাঁধ ধরে আচ্ছা করে এক ঝাঁকুনি লাগাই। চেঁচিয়ে উঠে বলি, 'কী হয়েছে তাই বলো। আমি যেটুকু করছি চাকরির খাতিরে। বুড়ো প্রিয়গোপালের পাগলামি সহ্য করা ছাড়া আমার উপায় কি। কিন্তু তোমাদের ধারণা আমি যেন প্রিয়গোপালের সঙ্গে জোট বেঁধেছি। এক অসৎ কাজে আমি ওঁর সহকারী হয়েছি। এতই যদি অবিশ্বাস আমার ওপর হয়ে থাকে বেশ করেছি।'

কিন্তু লিফট গ্রাউন্ড ফ্লোরে নেমে আসে। আমি একটি কথাও শম্পাকে বলতে পারি না। শম্পার ঔদাসীন্য দেখে মনে হয় ওর আমার সম্বন্ধে কোন কৌতূহল নেই, কোন জিজ্ঞাস্য নেই। সে যা জানবার সব জেনে ফেলেছে। তার সিদ্ধান্ত অনড় অটল।

তবু আমি সেদিন রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভাবলাম শম্পাকে অন্ততঃ খোলাখুলিভাবে ব্যাপারটা বলতে হবে। সে যদি ভুল বুঝে থাকে সেই ভুল মুছে দিতে হবে। কেন, কী এমন দায় পড়েছে? শম্পা আমার কে? কেউ না। তবু মৃদু এক সৌহৃদ্যের সৌরভ আমি ওর মধ্যে পেয়েছি। জীবনের অনেক অভ্রান্তির মধ্যে আমি সেই মধুর স্মৃতিটুকু রেখে দিতে চাই। আর কিছু নয় শুধু এক ফোঁটা বন্ধুত্ব। সেই বন্ধুত্ব কোন ভার বহন করে না, পরস্পরের কাছে কিছু প্রত্যাশা করে না। শুধু সান্নিধ্যেই তা পরিতৃপ্ত থাকে।

মন স্থির করতে আরো দু একদিন লাগল, আরো দু একটি রাত। কী বলব তাও মনে মনে গুছিয়ে নিতে হল। আমি তো প্রিয়গোপালের মত বক্তা নই। ওর জিভে কথা যেন তৈরী হয়েই থাকে। আমার তা হয় না। আমাকে কথা খুঁজে আনতে হয়।

কিন্তু শম্পার সঙ্গে দেখা হল না। ও কখন বেরোয় কখন ফিরে আসে বুঝতেই পারি না। আরো দিন দুই গেল। তারপর আমি রুনু বউদিকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'শম্পার খবর কি? ওকে দেখছি না যে।'

রুনু বউদি মুখ টিপে হেসে বললেন, 'বড্ড লেট হয়ে গেছে। আর ওর খোঁজখবর করে কোন লাভ নেই দীপক।'

বললাম 'তার মানে?'

রুনু বউদি বললেন, 'মানে পরিষ্কার। শম্পা ছুটি নিয়ে বাড়িতে ওর মার কাছে চলে গেছে। ওর যে বিয়ে।'

আমি বললাম, 'বিয়ে!'

বিস্ময়ের মাত্রাটা বড় চড়ে গেল। আমি নিজেই লজ্জিত হলাম।

রুনু বউদি বলালন, 'হ্যাঁ বিয়ে। সম্বন্ধ দেখাদেখি তা অনেক দিন ধরেই চলছিল। কিন্তু লেগেও লাগছিল না। এবার প্রজাপতি ওর কাঁধে এসে বসেছে। বিয়ে কোথায় হচ্ছে জানো?'

আমি যন্ত্রবৎ বললাম, 'না।'

রুনু বউদি বললেন, 'টেনথ ফ্লোরের রায়চৌধুরীদের সঙ্গে। ছেলে ইঞ্জিনিয়ার, ভিলাইতে কাজ করে। মোটা মাইনে। শম্পাকে দেখেই পছন্দ করেছে। একেই বলে প্রজাপতির নির্বন্ধ। ওই শম্পার জন্যে শর্মিষ্ঠা কি কম খোঁজাখুঁজি করেছে? গোপনে

'গোপনে কাগজে বিজ্ঞাপন পর্যন্ত দিয়েছে। কিন্তু শম্পার বর যে এই বাড়িরই টপ ফ্লোরে ঘুপটি মেরে লুকিয়ে ছিল কে জানত সে কথা ? ছেলেটি মাসখানেকের ছুটি নিয়ে এসেছিল। আরো কিছু-দিন ছুটি বাড়িয়ে নিয়ে একেবারে বউ সঙ্গে করে চলে যাবে।'

বললাম, 'ভালই তো।'

রুনু বউদি বললেন, 'নিমন্ত্রণের চিঠি তুমিও পাবে একখানা।'

বললাম, 'কেন, কোন্ সুবাদে ?'

রুনু বউদি বললেন, 'বাঃ, অনামিকার সেক্রেটারি যদি নিমন্ত্রিত না হয়, আমরা অনুষ্ঠান বয়কট করব। তবে বিয়ে এখানে হচ্ছে না। বিয়ে হচ্ছে সেই নিউ ব্যারাকপুরের বাড়িতে। শম্পার মায়ের ইচ্ছা তাই।'

ঘরে ফিরে গিয়ে নিজেকে সান্ত্বনা দিলাম যাক শম্পার কাছে নিজের মান আর খোয়াতে হল না। আর একটু হলেই সেই অপকর্মটি করে ফেলেছিলাম আর কি। আমি এবার ভাবতে লাগলাম তা হলে ব্যাপারটা কি। শম্পার বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক হয়ে গেছে বলেই সে কি অন্য পুরুষের সঙ্গে কথাবার্তা বন্ধ করেছে ? নাকি অন্য হীন জাতীয়া নারীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কল্পনা করে সে আমার সংস্রব বর্জন করেছে ?

মিসেস দত্তগুপ্ত যত তাড়াতাড়ি ফিরবেন বলে গিয়েছিলেন তা কিন্তু ফিরতে পারলেন না। প্রথমতঃ ওঁর পুত্রবধূর অসুখ সারতে সময় লাগল। তারপর তিনি কেদারবদরী যাওয়ার এক সুযোগ পেয়ে গেলেন। একটি চেনা দল যাচ্ছে সেখানে। মিসেস দত্তগুপ্তকে তারা দলনেত্রী করে নিল। খরচ যোগালেন বড় ছেলে।

মিসেস দত্তগুপ্ত অবশ্য সপ্তাহে সপ্তাহে স্বামীকে চিঠি লেখেন। খামের চিঠি। সেই চিঠির সঙ্গে আমার নামের চিঠিও থাকে। আমি সব খুঁটিনাটিরই জবাব দিই। শুধু প্রিয়গোপালের নিষেধ আছে বলে শ্যামলীর কর্মান্তর এবং রূপান্তরের খবরটি তাঁকে জানাইনি।

প্রিয়গোপাল আমাকে চিঠি লিখতে দেখে একদিন বললেন, 'ওহে দীপক, আমার জবানীতেও দু চার লাইন লিখে দাও।'

হেসে বললাম, 'সেকি কথা। দাম্পত্য চিঠির জবাবও আমাকে দিতে হবে ?'

তিনি বললেন, 'আর দাম্পত্য চিঠি। সে কোন প্রাগৈতিহাসিক আমলের ব্যাপার। আমি তো আর জাতিস্মর নই যে পূর্বলগ্নের কথা গরগর করে বলে যাব। সেহানবীশের সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে তো? সে বেশ মজার কথা বলে। কবে যে ঘি দিয়ে ভাত খেয়েছিলাম ভাই। এখন আর আঙুল শুঁকে লাভ কি। তার গন্ধটুকুও কি আছে?'

বললাম, 'আমি যতদূর জানি শেষ পর্যন্ত ওই গন্ধটুকুই তো থাকে।'

তিনি বললেন, 'তোমার জানা অসম্পূর্ণ। সবাইয়ের বেলায় তা থাকে না। জীবনকে জেনারালাইজ করতে যেয়ো না। সরলীকরণ সমীকরণের জালে জীবনকে ধরতে পারবে না। সে তোমার জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবে।'

হঠাৎ আমি বললাম, 'আপনিও যান না। তীর্থ করে আসুন না একবার।'

প্রিয়গোপাল বললেন, 'যৌবনে উত্তর যৌবনে একবার কেন অনেকবার ঘুরেছি। তীর্থ নয় দেশ ভ্রমণ। এখন আর শরীরে অত ধকল সয় না। আমরা দুজনে ভাগাভাগি করে নিয়েছি। তিনি তীর্থে তীর্থে ঘুরবেন। আর আমি থাকব একটি রূপ-তীর্থের পাদমূলে। হাসছ যে?'

আমি বললাম, 'আপনি যে সব কাণ্ড করছেন তার মধ্যে রূপই বা কোথায় তীর্থই বা কোথায়? জানেন এত বড় এই ফ্ল্যাট বাড়িটার বাসিন্দারা আমাদের কী চোখে দেখছে? তারা একটি মাত্র লেবেলই আমাদের গায়ে এঁটে দিচ্ছে—পারভারট্। আপনার এই হিতৈষণার আর কোন ব্যাখ্যা করতেই তারা রাজি নয়।'

মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে রইলেন প্রিয়গোপাল। ক্রোধে তাঁর মুখ এখনো রক্তাক্ত হয়। সেই মুহূর্তে আমার মনে হয় বৃদ্ধ বয়সেও সব রূপ তাঁর নষ্ট হয় নি। যা অবশিষ্ট আছে তাও কম নয়।

একটু বাদে তিনি নিজেকে শান্ত আর সংযত করে নিলেন। তারপর মৃদু স্বরে বললেন, 'বলতে দাও। ওরা কি বলে না বলে আমি গ্রাহ্য করি না। তোমার অবশ্য লোকনিন্দা, লোকলজ্জার

পরোয়া করতে হয়। আমার পরকাল বলে কিছু নেই, তোমার আছে। পরকাল মানে পরলোকের দিন রাত্রি নয়, ইহলোকেরই ভবিষ্যৎ। দীপক, তোমার ভবিষ্যৎকে আমি চিরকালের জন্যে বন্ধক রাখব না। অচিরকালের মধ্যেই release করে দেব। তবে এইটুকু আশা করব আমার যখন নুন খেয়েছ তুমি পরের মুখে ঝাল খাবে না। যা বলবার নিজের চোখে দেখে বলবে।'

আমি মনে মনে বললাম, সব কি আর চোখে দেখা যায়।

প্রিয়গোপাল বললেন, 'ফ্লার্টিং এণ্ড কেয়ারেসিং। **That's all.** তুমি বলতে পার আমার বয়সে এর চেয়ে বেশী আর কীই বা ক্ষমতা থাকতে পারে। সে কথা ঠিক। কিন্তু ক্ষমতা যখন ছিল তখনো তার ব্যবহার কি অপব্যবহার খুব কমই করেছি। তোমার মত নীতিবাগীশ ছিলাম বলে নয়, দরকার বোধ করিনি বলে।'

সেদিন আর প্রিয়গোপাল আমাকে গুড নাইট জানালেন না। আমারই অবশ্য জানাবার কথা। তিনি বস, আমি ভৃত্য। কিন্তু প্রিয়গোপাল উলটো কথা বলেন। 'তুমি বুড়ো মানুষের কাছে যাবে কেন। বুড়ো মানুষই নিজের গরজে যৌবনকে ছুঁতে আসবে।'

কিন্তু আজ আর সেই বৃদ্ধ আমার খোঁজ নিতে এলেন না। আমি শুয়ে শুয়ে ভাবলাম, গেল বুঝি আমার চাকরিটি। অচিরকাল মানে কি এই রাতটুকু পর্যন্ত?

কিন্তু সকালে তাঁর প্রসন্ন মুখ দেখে আশ্বস্ত হলাম। কার যেন ফোন এসেছে। তিনি রিসিভার তুলে হাসতে হাসতে বলছেন, 'ও তুমি? প্রভাতে উঠিয়া ও গলা শুনিনু দিন যাবে আজি ভালো।'

কার গলা জানি না। তবে আমাদেরও দিনটি আজ ভালোই যাবে তাতে কোন সন্দেহ রইল না।

ইতিমধ্যে আবার এক কাণ্ড ঘটল। নতুন ঘটনা নয়, আগের ঘটনারই পুনরাবৃত্তি। বিজয় ফের এল তার স্ত্রীর খোঁজে। শ্যামলী যে কাজের জায়গা বদল করেছে সে খবর নিয়ে এসেছে রুনু বউদির কাছ থেকে। আজ বিজয় একাই এসেছে। ভগ্নীপতিটি সঙ্গে নেই।

প্রিয়গোপাল তাকে সমাদর করে ডেকে আনলেন। হেসে বললেন, 'এসো এসো। তোমার গুণ গরিমার কথা আমি আগেই শুনেছি।'

বিজয় বলল, 'শ্যামলী বলেছে বুঝি?'

প্রিয়গোপাল বললেন, 'শুধু শ্যামলী কেন আরো কারো কারো কাছে শুনেছি। তোমার উদ্দেশ্যটা কি।'

বিজয় বলল, 'উদ্দেশ্য আর কি স্যার। আমার পরিবারকে আমি নিয়ে যেতে এসেছি।'

'বেশ তো, যাও নিয়ে।'

প্রিয়গোপাল আমাকে বললেন, শ্যামলীকে ডেকে দিতে। কিন্তু শ্যামলী ইশারায় বলে দিল যে আসবে না বিজয়ের সামনে। আমরা যেন তাকে যেতে বলে দিই।

প্রিয়গোপাল বললেন, 'ও যে আসতে চায় না বিজয়। ওর বুকে পিঠে গালে কপালে তুমি যে সব প্রণয়চিহ্ন এঁকে দিয়েছ তাতে ও আর ভরসা পাচ্ছে না তোমার সঙ্গে যেতে।'

বিজয় বক্রোক্তিটুকু ভালোই বুঝতে পারল। একটু হেসে বলল, 'স্যার এই কি জজসাহেবের বিচার হল? বউকে না মারে কে স্যার? আমাদের মত চাষাভুষোর ঘরে তো মারেই, আপনাদের মত বাবু ভুঁইয়াদের ঘরও বাদ যায় না। সে সব ঘরেও মারামারি যথেষ্টই হয়। তাই বলে কজনের বউ ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। তাই যদি আসত তাহলে হাজার হাজার ঘর খালি পড়ে থাকত। সে সব ঘরে আর মেয়েলোক বাস করত না।'

প্রিয়গোপাল বললেন, 'তোমার যুক্তি অকাট্য বিজয়লাল। তোমার উকিল হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ও যদি না যেতে চায় আমি তো হুকুম করতে পারি না, তুমি ওর চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে যাও।'

বিজয় বলল, 'চুলের মুঠি ধরব কেন স্যার। আমি ওর হাতে পায়ে কি কম ধরেছি? তাতেও ওকে নিতে পারিনি। এখন তো আরো পারব না।'

'কেন?'

বিজয় হাসল, 'স্যার, আপনি নাকি ওকে মেমসাহেব

বানিয়েছেন ?'

প্রিয়গোপাল চট্ করে জবাব দিতে পারলেন না। লক্ষ্য করলাম আজও তাঁর মুখ আরক্ত হয়ে উঠেছে। সেই রক্তাভা শুধু ক্রোধেরই নয়।

আমি ধমকে উঠলাম বিজয়কে, 'কী যা তা বলছ ?'

প্রিয়গোপাল বললেন, 'যদি বানিয়েই থাকি তাতে কী হয়েছে ?'

বিজয় বলল, 'কী আর হবে স্যার। যে সুখের স্বাদ ও এখানে এসে পেয়েছে তাতে কি গরিবের ঘরে গিয়ে ওর মন ভরবে ? তার চেয়ে এক কাজ করুন না স্যার।'

প্রিয়গোপাল বিজয়ের দিকে তাকালেন।

বিজয় বলল, 'স্যার ওকে যেমন মেমসাহেব বানিয়েছেন আমাকেও তেমনি সাহেব করে দিন না।'

এবার প্রিয়গোপালের আর একবার নির্বাক হবার পালা।

একটু বাদে তিনি মুখ খুললেন। মৃদু হেসে বললেন, 'বিজয়, সাহেব কেউ কাউকে ঠিক করে দিতে পারে না। ওটা নিজেরই চেষ্টা করে হতে হয়। উন্নতির পথ সবাইয়ের জন্যেই খোলা আছে। তুমিও চেষ্টা করলে বড় হতে পার, ভালো হতে পার।'

বিজয় হতাশার ভঙ্গিতে হাসল। তারপর মুখ নেড়ে বলল, 'ওই কথাটি বলবেন না স্যার। বললেও বিশ্বাস করতে পারব না। উন্নতির পথ সবাইয়ের জন্যে খোলা নেই। সবাই চেষ্টা করার সুযোগ পায় না। না পেয়ে পেয়ে ইচ্ছাটাও মরে যায়।'

বিজয় আমাদের দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করল। তারপর বিদায় নিল।

ওর মুখে সস্তা দেশী মদের গন্ধ ভুরভুর করছিল।

কদিন প্রিয়গোপালকে একটু চিন্তান্বিত দেখলাম। বিজয়ের কথাটাই ভাবছেন কিনা কে জানে। ইজিচেয়ারে চুরুট খাচ্ছেন আর ভাবছেন।

শ্যামলী আমাকে একান্তে ডেকে নিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'কী হয়েছে ওঁর ?'

হেসে বললাম, 'তা তো জানি না। বোধহয় ভাবান্তর হয়েছে। মাঝে মাঝে এমন হয়।'

দুতিনদিন বাদেই তিনি ফের চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। বললেন, 'চল হে দীপক একটু বেড়িয়ে টেরিয়ে আসি। অনেকদিন ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে আছি।'

বললাম, 'কোথায় যাবেন ?'

প্রিয়গোপাল বললেন, 'যাব চন্দ্রকেতুগড়ে। ইতিহাসের যুগে।'

চট করে কথাটার অর্থ ধরতে পারলাম না। বললাম, 'তার মানে ?'

প্রিয়গোপাল বললেন, 'মানে শ্যামলীদের দেশে। বেড়াচাঁপায়।'

এবার আমার মনে পড়ল। শ্যামলী বলেছিল বটে ওদের বাড়ির কাছে সেই গড় খুঁড়ে বার করা হয়েছে। অনেকেই দেখতে যায় দলবল নিয়ে, কেউ কেউ আবার পিকনিক করতেও যায়। আমরা যদি একবার বেড়াতে যাই শ্যামলীর দাদা বউদি খুব খুশী হবে।

কি ইতিহাস কি প্রত্নতত্ত্ব কি পিকনিক কোন ব্যাপারেই আমার তেমন আকর্ষণ নেই। আমি খুব একটা উৎসাহ বোধ করিনে। কিন্তু কেন জানি না প্রিয়গোপাল দেখলাম খুব উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন।

'চল, শ্যামলী যাবে বলেছিলে যে, চল।'

শ্যামলী লজ্জিত হয়ে বলল, 'একসঙ্গে যাব ?'

'একসঙ্গেই তো যাবে। তুমিই তো হবে পথপ্রদর্শিকা। তুমিই তো তুলে নেবে ঊর্ধ্বলোকে। The eternal womanly draws us above'.

আমি অবাক হয়ে ভাবলাম কাকে কি বলছেন প্রিয়গোপাল। আমার মনে পড়ল কথায় কথায় তিনি আমাকে একদিন বলেছিলেন, 'কে যেন আমার চোখে অদৃশ্য এক মায়াকাজল পরিয়ে দিয়ে যায়। তাতে পথের প্রষ্টিটিউটও প্রিনসেস হয়ে ওঠে; পেত্নী হয়ে ওঠে অপ্সরী।'

সেই রূপের কাজল কি erotic passion ছাড়া অন্য কিছু ?

শ্যামলী বলল, 'তাহলে আমি সকাল সকাল বাসে চলে যাই, আপনারা খানিক বাদে গাড়িতে আসুন। গড়ের সামনে আমি আর দাদা আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করব।'

প্রিয়গোপাল আপত্তি করে বললেন, 'তা কি হয় ?

এক যাত্রায় পৃথক ফল যদি বা হয়, পৃথক যান কেন হতে দেব? চল একসঙ্গেই চল। বলা যায় না হয় তো এটাই লাস্ট রাইড টুগেদার।'

প্রিয়গোপাল বলা সত্ত্বেও শ্যামলী খুব দামী শাড়িটার কিছু পরল না। যে কয়েকখানা শাড়ি ছিল তার মধ্যে সবচেয়ে কম দামি শাড়িখানা বেছে নিল।

আমি বললাম, 'উনি যখন দিয়েছেন পরছ না কেন?'

শ্যামলী বলল, 'কী যে বলেন, লজ্জা করে না বুঝি, দাদা কি ভাববে।'

গাড়িতে উঠে একপাশে কুণ্ঠিতা কুণ্ঠিতা হয়ে রইল শ্যামলী। এই অবিশ্বাস্য সৌভাগ্য ওকে বিব্রত করে দিয়েছে। ওর মধ্যে যদি কিছু আমার ভালো লেগে থাকে সে ওর এই দ্বিধাটুকু। লজ্জা ভয়ের আড়ালে ওর গোপন আনন্দটুকু। ও যেন নিতেও পারছে না, আবার ফিরিয়ে দেওয়ার সাধ্যও ওর নেই।

গ্রামে এসে পৌঁছতে শ্যামলী বলল, 'আগে আমাদের বাড়ি চলুন।'

প্রিয়গোপাল বললেন, 'বেশ চল। আগে একালকে দেখি তারপর পুরাকাল।'

চারদিকে বাঁশের বাখারি ঘেরা ছোট বাড়ি। ছোট বড় খান তিনেক ঘর। ওপরে টালির চাল। বাড়িতে গাছগাছালি বেশ আছে। ফলের গাছই বেশী। আম, জাম, নারকেল, উত্তর দিকের ঘরের কোণায় একটি আনারসের গাছ। সোনালি রঙ নিয়ে আনারসটি পেকে উঠেছে। শ্যামলীর দাদার নাম পরেশ দাস। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স। মাথায় কাঁচা পাকা চুল। ভিতর থেকে নিজেই খান দুই চেয়ার টেনে নিয়ে এলেন। সমাদর করে বললেন, 'বসুন বসুন। কী ভাগ্য আমাদের। সিমি বলেছিল আপনারা একদিন আসবেন। কিন্তু আজই যে—' তারপর শ্যামলীর দিকে চেয়ে বললেন, 'তুই আমাদের আগে জানালিনে কেন?'

শ্যামলী বলল, 'ওঁরা কি জানাবার সময় দিলেন দাদা? আর জানালেই বা কী হত? আমরা কী এমন আদর-যত্ন করতে পারতাম?'

প্রিয়গোপাল বললেন, 'আদর-যত্ন কম হচ্ছে কিসে? পরেশ, তোমার গাছগুলিতে তো বেশ ফল ধরেছে।'

পরেশবাবুর মুখে আত্মপ্রসাদের হাসি ফুটল। তিনি বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, সব আমার নিজের হাতে লাগানো গাছ। প্রত্যেকটি গাছে ফল ধরেছে।'

গুটি পাঁচ ছয় ছোট ছোট ছেলে মেয়ে অফুরন্ত কৌতূহলে মাঝে মাঝে এসে উঁকি দিচ্ছিল। খোলা গা। কারো পরনে কিছু আছে। কারো বা সেটুকু নেই।

প্রিয়গোপাল তাদের দিকে আঙুল দেখিয়ে হেসে বললেন, 'আর এরা বুঝি সব ডাল ভেঙে পড়েছে?'

পরেশবাবু লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসলেন।

প্রিয়গোপাল বললেন, 'সবই তোমার?'

পরেশবাবু বললেন, 'না, একটি সিমির। সব বেশী বয়সে এসেছে স্যার। সবাইকে মানুষ করে যেতে পারব এমন আশা—'

প্রিয়গোপাল সে সম্বন্ধে কোন ভরসা না দিয়ে বললেন, 'ভালো, ওদের এখানে ডেকে আনো।'

পরেশবাবু বললেন, 'এই তোরা এদিকে আয়। প্রণাম কর এসে।'

সঙ্গে সঙ্গে ঢিপ ঢিপ করে ওরা এসে অমোদের দুজনকে প্রণাম করতে লাগল।

আশ্চর্য, প্রিয়গোগাল তাদের প্রত্যেকটিকে কাছে ডেকে নিয়ে আদর করলেন। শিশুস্পর্শের জন্য কাতর বৃদ্ধের বুভুক্ষ হৃদয়কে আমি উদঘাটিত হতে দেখলাম।

পরেশবাবু বললেন, 'করছেন কি। আপনার জামা কাপড় ময়লা হয়ে যাবে যে।'

প্রিয়গোপাল বললেন, 'হোক না।'

শ্যামলীর বৃদ্ধা মার সঙ্গেও আলাপ হল। তিনি কালোমত রোগা চার পাঁচ বছরের একটি ছেলেকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'এইটি হল সিমির। আমার মেয়ে তো ছেলে ছেলে করেই পাগল। বলে আমার ছেলের লেখাপড়া হচ্ছে না মা। আমি বলি ছেলে কি তোর পেট থেকে পড়েই লিখতে শিখবে, পড়তে শিখবে? আপনাদের

কথা খুব বলে সিমি। বলে, 'মা এত আদর-যত্ন আর কোথাও পাইনি।' তারপর প্রিয়গোপালের দিকে অনুরোধ করে বললেন, 'মেয়েটা বড় অভাগী। দেখবেন বাবা ও যেন ভেসে না যায়।'

ঘোমটা টানা একটি বউ এবার সামনে এল।

বৃদ্ধ বললেন, 'আমার বউমা।'

বউটি আমাদের দুজনকেই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল।

আমি কুণ্ঠিত হয়ে বললাম, 'আমাকে আবার কেন?'

প্রিয়গোপাল হেসে বললেন, 'তুমিও কি কম বুড়ো নাকি? জ্ঞানবৃদ্ধ। কিছু বলা যায় না, এতক্ষণে হয়তো আমাদের চেহারা অদল বদল হয়ে গেছে। তোমাকে আমার মত দেখাচ্ছে। আমাকে তোমার মত।'

ওঁরা জলখাবারের জন্যে খুব অনুরোধ করলেন। কিন্তু আমরা দুজনে দুটি ডাব ছাড়া আর কিছু খেলাম না। শ্যামলী আমার দিকে চেয়ে বলল, 'আপনি তো খেতে পারতেন।'

প্রিয়গোপাল ছেলেমেয়েদের মিষ্টি খাবার জন্য দশ টাকার একখানি নোট পরেশবাবুকে দিলেন।

পরেশবাবু বললেন, 'এসব আবার কেন দিচ্ছেন। আপনি তো কিছুই খেলেন না। আনারসটি আপনি নিয়ে যান। আমাদের গাছপাকা ফল। খেতে খুব মিষ্টি।'

প্রিয়গোপাল হাত পেতে সেই ফলটিকে নিয়ে বললেন, 'দেখতে আরো সুন্দর।' তারপর আমাকে ফলটি দিয়ে বললেন, 'এর জান্তব রূপ দেখেছ? মনে হয় না passion embodied?'

সব রূপের মধ্যেই কি প্যাশেন দেখেন প্রিয়গোপাল? সব রূপকেই কি তিনি প্যাশনেটলি ভালোবাসেন?

এরপর আমরা চন্দ্রকেতু গড় দেখতে গেলাম। শ্যামলীদের বাড়ির কাছেই সেই গড়। খুঁড়ে খুঁড়ে বার করা হয়েছে পুরাকালের একটি পুরীর ভগ্নাবশেষ। ইশারাটুকু মাত্র আছে। কিছু কিছু পাথরের মূর্তি। নানা ধরনের মাটির পাত্র। প্রিয়গোপাল ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন। যার পথ-প্রদর্শিকা হবার কথা সে কিন্তু সঙ্গে ছিল না। ছিলেন পরেশবাবু আর ছিলাম আমি। কিন্তু প্রিয়গোপালের যেন আর কাউকে সঙ্গে পাওয়ার দরকার ছিল

না। তিনি তন্ময় হয়ে সব দেখছিলেন। হঠাৎ কী করে যেন তাঁর খেয়াল হল আমি তাঁর পাশে রয়েছি। তিনি বললেন, 'দীপক, এও এক রূপতীর্থ। রূপের আধার তো পৃথিবীতে একটি নয়। অসংখ্য, অসংখ্য। যত্র জীব তত্র শিব কিনা জানি না কিন্তু যত্র জীব তত্র রূপ। শুধু জীবই বা বলি কেন যত বস্তু তত রূপ। গাছ-পালায়, পাখি পতঙ্গে, ফলে জলে এই রূপের ছড়াছড়ি। মানুষের হাতে গড়া বস্তুতে বস্তুতে তার স্থাপত্যে ভাস্কর্যে, তার কাব্যে সাহিত্যে সংগীতে চিত্রকলায় অফুরন্ত রূপের ধারা। ঈশ্বর যদি কোথাও থাকেন এই বিশ্বরূপের মধ্যেই আছেন।'

একটু চুপ করে থেকে তিনি যেন খানিকটা আক্ষেপের সুরে বললেন, 'কিন্তু সব রূপ আমাদের সবাইয়ের চোখে পড়ে না। শুধু একটি দুটি রূপের মধ্যে আমাদের দৃষ্টি ঘোরাফেরা করে। রূপকে আমরা কূপ করে তুলি। আর সেই কূপের মধ্যে আজীবন মুখ গুঁজে পড়ে থাকি।'

তারপর প্রসঙ্গটা অন্যদিকে ঘুরে গেল। এখানে খননের কাজ বন্ধ আছে কেন, যতটা কাজ হওয়া উচিত ছিল, হতে পারত তা হয়নি। অন্ততঃ ভালো একটা মিউজিয়াম তৈরি করা যেত, তাও কেউ করেনি। অর্থের অভাব তো আছেই, কিন্তু তাই সব নয়। অভাব উদ্যোগ উদ্যম উৎসাহ উদ্দীপনার। দেশীয় প্রত্নতত্ত্বের উন্নতি যেটুকু যা হয়েছে সেই বৃটিশ আমলে। তারপর আমরা আর বেশীদূর এগোতে পারিনি।

শ্যামলীকে নিয়ে আমরা ফিরে এলাম। প্রিয়গোপাল অবশ্য বলেছিলেন, 'তোমার যদি ইচ্ছে হয় তুমি ছেলের কাছে দু একদিন থেকে যেতে পার।'

কিন্তু শ্যামলী কী ভেবে যেন বলল, 'না এখন যাই। পরে কিন্তু আমাকে বেশী দিনের জন্যে ছুটি দেবেন।'

প্রিয়গেপোল হেসে বললেন, 'বেশ তো।'

পরদিন ন্যাশনাল লাইব্রেরী থেকে মোটা মোটা আর্কিয়োলজির বই আনালেন প্রিয়গোপাল। কিছু বই দোকান থেকে কিনেও নিলেন। কদিন ধরে চলল প্রত্নতত্ত্বের অধ্যয়ন আলোচনা। টেলিফোন করে প্রিয়গোপাল তাঁর দু একজন প্রত্নতাত্ত্বিক বন্ধুকে বাড়িতে

আনালেন। নিজেও গেলেন তাঁদের বাড়িতে। সাহিত্য বাসরের আগামী অধিবেশনে হয়তো প্রত্নতত্ত্বের ওপরই কিছু বলবেন তিনি।

আমাকে ডেকে বললেন, 'দীপক কটা দিন আমি এইসব নিয়ে ব্যস্ত আছি। শ্যামলীর শিক্ষার ভারটা কদিন তোমার হাতে থাক। খবরদার যেন ঢিলে না পড়ে। তাহলে আর হবে না।'

তারপর একটু হেসে বললেন, 'আমি শুধু শুরু করে দিয়ে যাব। এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ভার তোমার ওপর। সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব তোমার ওপর। তুমি দীর্ঘদিন পৃথিবীতে থাকবে। আমি আর কদিন !'

আমি বললাম, 'আপনিও দীর্ঘদিন থাকুন না।'

তিনি হেসে বললেন, 'আমি পিতামহ হয়েছি, কিন্তু পিতামহ ভীষ্ম তো আর হইনি যে মৃত্যু আমার ইচ্ছাধীন। যে কোন দিন চলে যেতে পারি আবার দশ বছর থাকতেও পারি। কত বন্ধু কত আত্মীয়স্বজন চলে গেল। বছর বছর বিয়োগপঞ্জীর অবয়ব বাড়ে। যে দীর্ঘজীবী হয় তাকে স্বল্পায়ুদের মৃত্যুর মালা গলায় পরে চলতে হবেই। আর কোন গত্যন্তর নেই। আমি ভাবি জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে হাতে গোনা যে কটি প্রহর আমার জন্যে আছে সেগুলিকে নিয়ে আমি কী করব ?'

'ভেবে কিছু ঠিক করেছেন ?'

তিনি বললেন, 'কই আর তা করতে পারলাম ? বিশ বছর ধরে কেবল ভাবছি আর ভাবছি। কত জল্পনা কল্পনা। কিন্তু কোন পরিকল্পনাই কাজে লাগল না। অন্য কারো পূর্ব পরিকল্পিত পথে জীবন যেন বয়ে চলেছে। সেই একই ভুলের পুনরাবৃত্তি। ভুল আর ভুল সংশোধন। সেই রূপ দেখে পতঙ্গের মত এখনো ছুটে যাওয়া আবার ভষ্ম হয়ে উড়ে আসা। এরই নাম ভালো-বাসা।'

শ্যামলী একদিন বলল, 'আচ্ছা বলুন তো কী হয়েছে ওঁর। আমি কি কোন দোষ করেছি ?'

আমি তাকে অভয় দিয়ে হেসে বললাম, 'তুমি আবার কী দোষ করবে। উনি ওঁর নিজের দোষ বুঝতে পেরেছেন।'

প্রিয়গোপাল ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক একটু যেন সরে

রইলেন। পুরোন বই আর পুরোন বুড়ো বুড়ো বন্ধু আবার তাঁর অবলম্বন হয়ে উঠল। অবশ্য তাঁর সমবয়সীদের মধ্যে বন্ধুর সংখ্যা কম। প্রায়ই মৃত। দু একজন যাঁরা আছেন, তাঁদের ভিন্ন মত, ভিন্ন পথ। বেশীর ভাগই আনুষ্ঠানিক ধর্মের আশ্রয় নিয়েছেন। প্রিয়গোপাল ও পথে যাননি। ফলে বন্ধুসঙ্গ থেকে তিনি প্রায় বঞ্চিত হয়ে রয়েছেন।

তিনি যখন সরে গেলেন বাধ্য হয়েই আমি আর শ্যামলী অনেকটা কাছাকাছি এলাম। যেটুকু কাজই থাকুক আমাদের এক সঙ্গে করতে হয়, অন্ততঃ তার উদ্যোগ আয়োজন ব্যবস্থাটুকু না করলে চলে না।

খানিকটা সময় ওকে লেখাপড়া শেখাবার কাজেও আমার কাটে। এদিক থেকে ওর আগ্রহ যথেষ্ট। তাড়াতাড়ি শেখবার ক্ষমতাও যথেষ্ট আছে। হাতের লেখাটি বেশ সুন্দর। ওর বাবাও নাকি লেখাপড়া খুব ভালোবাসতেন। গ্রামের স্কুলে ক্লাস সিক্স অবধি পড়িয়েছিলেন। স্কুলে তার চেয়ে উঁচু ক্লাস আর ছিল না। শ্যামলীর কিন্তু আরো পড়াশোনা করবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তাও আর হয়ে ওঠেনি। বাবা মারা গেলেন। আর দাদা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে দিলেন। ছেলে সম্বন্ধে তেমন খোঁজ খবর করেননি। এখন তার প্রায়শ্চিত্ত করছেন।

প্রিয়গোপাল দূর থেকে আমাদের দেখেন। এক সঙ্গে কাজ করতেও দেখেন, গল্প করতেও দেখেন। তিনি কি এই রকমই চেয়েছিলেন? এই নৈকট্যের কি তিনিই ঘটক? তিনি কি এতে পুরোপুরি খুশী? মাঝে মাঝে ঈর্ষার সূঁচ এখনো তাঁকে বিদ্ধ করে বলে আমার মনে হয়।

তিনি আমাকে একদিন বললেন, 'যৌবন যখন কিছু ভোগ করে তার সেই সম্ভোগ অবিমিশ্র নিরবচ্ছিন্ন। কিন্তু বার্ধক্য সেই সুখ থেকে বঞ্চিত। তার সম্ভোগে পদে পদে কাঁটা। তার রসসম্ভোগ বিতৃষ্ণা বৈরাগ্য অনুতাপ অনুশোচনার অপূর্ব রসায়ন।'

মিসেস দত্তগুপ্তের চিঠি মাঝে মাঝে আসে। তিনি কেদারবদরী সেরে আবার দিল্লীতে ফিরেছেন। কিন্তু নাতিনাতনীরা তাঁকে আসতে দিচ্ছে না। তিনি চেষ্টা করছেন চলে আসতে। হয়তো

আরো দিন পনের দেরি হবে।

কিন্তু আশ্চর্য কোন খবরবার্তা না দিয়ে কোন টেলিগ্রাম কি ট্রাংককল না করে তিনি যে তিনদিন যেতে না যেতেই এমন হঠাৎ এসে হাজির হবেন তা কে জানত।

কলিংবেলের শব্দ শুনে শ্যামলীই গিয়ে প্রথম দোর খুলে দিয়েছিল। অতিথি যে গৃহকর্ত্রী স্বয়ং তা সে ভাবতেই পারে নি। মিসেস দত্তগুপ্ত খুব যে অবাক হয়েছেন তা তাঁর হাবভাব দেখে মনে হল না। তিনি যেন সব জেনে শুনেই এসেছিলেন।

তবু তিনি শ্যামলীকে বললেন, 'তুমি এখানে যে?'

শ্যামলী বলল, 'দু মাস ধরে আমি তো এখানেই আছি মাসীমা।'

মিসেস দত্তগুপ্ত ওকে প্রচণ্ড এক ধমক দিয়ে বললেন, 'মাসীমা মাসীমা কোরো না। তোমাদের মত বদমাশদের আমি কেউ নই।'

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এতদিন ও এখানে আছে অথচ কিছু আমাকে তোমরা জানাও নি। সবাই সমান। হাড়েহাড়ে বদমাশ।'

আমি কিচ্ছু বলবার সুযোগই পেলাম না। এমন রুদ্রাণীর রূপ তাঁর কখনো দেখিনি।

প্রিয়গোপাল তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। একটু হেসে স্ত্রীকে সম্ভাষণ করতে গেলেন, 'এই যে এসেছ। সারপ্রাইজ ভিজিট। এ প্লেজান্ট সারপ্রাইজ।' মিসেস দত্তগুপ্ত বললেন, 'থামো থামো, আর রসিকতা করতে হবে না। তোমার কীর্তিকাহিনী আমি সব শুনেছি।'

'কার কাছে শুনেছ?'

'নাম কেন বলব? ভেবেছিলে এখানে আমার কোন লোক নেই কোন বন্ধু নেই? তারা আমাকে সব জানিয়েছে। এই বুড়ো বয়সে—মরবার দুদিন মাত্র বাকী আছে। বাড়ির একটা ঝিকে তুমি রানী করে সিংহাসনে বসিয়েছ। ছি ছি ছি!'

প্রিয়গোপাল বললেন, 'একটু শান্ত হও, ধৈর্য ধর। এই কি তোমার তীর্থযাত্রার ফল। মুখে একেবারে লাভাস্রোত নিয়ে ফিরে এসেছ? শোনই আগে ব্যাপারটা।'

মিসেস দত্তগুপ্ত বললেন, 'কী আবার শুনব। আমি তো চোখের সামনেই সব দেখতে পাচ্ছি।'

তারপর স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে ভাষায় ঝগড়া চলল তা শ্যামলী আর বিজয়ের মধ্যেও হতে পারত। পুরো একটা দিন একটি বিনিদ্র রাত ঝড় বয়ে গেল বাড়িতে।

মিসেস দত্তগুপ্ত কিচ্ছু খেলেন না। রুনু বউদি তাঁকে এসে অনেক সাধাসাধি করলেন। কিন্তু তাঁর সেই এক কথা। 'এই সব পাপ এ বাড়ি থেকে নেমে না গেলে আমি জলগ্রহণ করব না।'

প্রিয়গোপাল শেষ পর্যন্ত স্ত্রীর সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হলেন।

অপরাধীর মত আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তোমাকে কিছ নগদ টাকা দিচ্ছি। তুমি ততদিনে কিছু একটা খুঁজে নিতে পারবে।'

আমি বললাম, 'আমাকে কিচ্ছু আপনার দিতে হবে না।'

তারপর তিনি শ্যামলীকে ডেকে আমার সামনেই বললেন, 'তোমার জন্যে একটি আলাদা ব্যবস্থা করে দেব। আমার এক ডাক্তার বন্ধুর নার্সিং হোম আছে। তোমার অবশ্য নার্সিং এর ট্রেনিং নেওয়া নেই। তবে কিছু একটা সুযোগ সুবিধা তিনি করে দিতে পারবেন।'

শ্যামলী একটু চুপ করে থেকে বলল, 'দেখুন, আমার জন্যে ভাবিনে। আমার আর বাঁচতে ইচ্ছা করে না। যেখানে যাব সেখানেই অশান্তি, সেখানেই কেলেঙ্কারি। শুধু একজনের জন্যেই আমাকে বাঁচতে হবে। একজনের মুখের দিকে তাকিয়ে।'

প্রিয়গোপাল জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে সে?'

আমার বুকটা ঢিপ ঢিপ করে উঠল। ওঁর সামনেই শ্যামলী আমার নামটা করে ফেলবে নাকি।

শ্যামলী এবার মুখ তুলে তাঁর দিকে তাকাল। একটু যেন হাসিও ফুটল তার মুখে।

শ্যামলী বলল, 'আমার ছেলে। তাকে তো আপনি দেখে এসেছেন। সে যাতে ভালো হয়, মানুষ হয় তার একটা ব্যবস্থা করে দিন। একটা ভালো আশ্রম-টাশ্রমে সে যেন লেখাপড়া শিখতে পারে। সে যেন আমাদের মত না হয়।'

প্রিয়গোপাল অস্ফুটস্বরে শ্যামলীর কথারই প্রতিধ্বনি করলেন। খানিকটা আত্মগতভাবে বললেন, 'সে যেন আমাদের মত না হয়।'